শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা ৭

মণিমণ্ডন

প্রসিদ্ধ মণিকার রসময় সরকারের বাড়ি হইতে একটি বহুমূল্য জড়োয়ার নেকলেস চুরি গিয়াছে। সকালবেলা খবরের কাগজ পড়িবার সময় বিলম্বিত সংবাদের স্তম্ভে খবরটা দেখিয়াছিলাম। বেলা আন্দাজ আটটার সময় টেলিফোন আসিল।

অপরিচিত ব্যগ্র কণ্ঠস্বর, "হ্যালো ! ব্যোমকেশবাবু ?"

বলিলাম, "না, আমি অজিত। আপনি কে ?"

টেলিফোন বলিল, "আমার নাম রসময় সরকার। ব্যোমকেশ-বাবুকে একবার ডেকে দেবেন ?"

নাম শুনিয়া বুঝিতে বাকি রহিল না যে, চোর ধরিরার জন্য ব্যোমকেশের ডাক আসিয়াছে। বলিলাম, "সে বাথরুমে গিয়েছে, বেরুতে দেরি হবে। কাগজে দেখলাম আপনার দোকান থেকে নেকলেস চুরি গেছে।"

উত্তর হইল, "দোকান থেকে নয়, বাড়ি থেকে।—আপনি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যোমকেশবাবুর বন্ধু ?"

বলিলাম, "হ্যাঁ। ব্যোমকেশকে যা বলতে চান, আমাকে বলতে পারেন।"

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া রসময় বলিলেন, "দেখুন যে নেকলেসটা চুরি গেছে, তার দাম সাতান্ন হাজার টাকা। সন্দেহ হচ্ছে বাড়ির একটা চাকর চুরি করেছে, কিন্তু কোনও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। পুলিসে অবশ্য খবর দিয়েছি, কিন্তু আমি ব্যোমকেশবাবুকে চাই। তিনি ছাড়া নেকলেস কেউ উদ্ধার করতে পারবে না।"

বলিলাম, "বেশ ত, আপনি আসুন না। আপনি আসতে আসতে ব্যোমকেশও বাথরুম থেকে বেরুবে।"

রসময় একটু কাতরভাবে বলিলেন, "দেখুন, আমি বেতো রুগী, বেশী নড়াচড়া করতে পারি না। তার চেয়ে যদি আপনারা আসেন ত বড় ভাল হয়।"

যাহারা বিপদে পড়ে তাহারাই ব্যোমকেশের কাছে আসে, সে আগে কাহারও কাছে যায় না। আমি বলিলাম, "বেশ ব্যোমকেশকে বলব।"

রসময়ের মিনতি আরও নির্বন্ধপূর্ণ হইয়া উঠিল, "না না, বলাবলি নয়, নিশ্চয় আসবেন। আমি গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপনাদের কোনও অসুবিধা হবে না।"

"বেশ।"

"ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। এখনি গাড়ি পাঠাচ্ছি।"

মিনিট কয়েক পর একটি ক্যাডিল্যাক্ গাড়ি আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। ব্যোমকেশ বাথরুম হইতে বাহির হইলে তাহাকে সকল কথা বলিলাম এবং জানালা দিয়া গাড়ি দেখাইলাম। দেখিয়া শুনিয়া সে আপত্তি করিল না। আমরা ক্যাডিলাকে চড়িয়া যাত্রা করিলাম।

কলিকাতা শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে রসময় সরকারের গোটা পাঁচেক সোনাদানা হীরা-জহরতের দোকান আছে, কিন্তু তাঁর বসতবাড়ি বৌবাজারে। অল্পকাল মধ্যে গাড়ি তাঁহার দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল।

রসময় সরকারের বাড়িটি সাবেক ধরনের, একেবারে ফুটপাথের কিনারা হইতে তিনতলা উঠিয়া গিয়াছে। মাঝখানে উপরতলায় উঠিবার দ্বারমুক্ত সিঁড়ি, দুই পাশে দোকানের সারি। গৃহস্বামী উপরের দুইতলা লইয়া থাকেন।

সিঁড়ির দরজা ভিতর হইতে বন্ধ ছিল, গাড়ি গিয়া থামিতেই দ্বার খুলিয়া একটি যুবক বাহির হইয়া আসিল। শৌখিন সুদর্শন চেহারা, বয়স সাতাশ আটাশ। নমস্কার করিয়া বলিল, "আমার নাম মণিময় সরকার। বাবা ওপরে আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। আসুন।"

আমরা সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম। দ্বিতলে আছে রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, চাকরদের থাকিবার স্থান এবং তক্তপোশপাতা একটি বসিবার ঘর। আমরা দ্বিতল ছাড়াইয়া ত্রিতলে উঠিয়া গেলাম। এই ত্রিতলে গৃহস্বামী সপরিবারে বাস করেন।

তৃতীয় তলে উঠিলে গৃহস্বামীর বিত্তবত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। বিলাতী তালা লাগানো ভারী দরজায় রেশমী পর্দা, মেঝেয় পুরু গালিচা ; ড্রয়িংরুমটি দামী আসবাব দিয়া সাজানো, গদি-মোড়া সোফা সেটের মাঝখানে কাশ্মীরী কাঠের নিচু টেবিল ; দুই জানালার মাঝখানে বইয়ের আলমারি, দেয়ালে পারসিক ছবি-আঁকা ট্যাপেস্ট্রি, ইত্যাদি। উপস্থিত ঘরটি একটু অবিন্যস্ত। মণিময় আমাদের ঘরে লইয়া গিয়া বলিল, "বাবা, ব্যোমকেশবাবু এসেছেন।"

দেখিলাম রসময় সরকার একটি চেয়ারে বসিয়া ডান পা সম্মুখ-দিকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন এবং একটি বিবাহিতা যুবতী তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া তাঁহার অঙ্গুষ্ঠে সেঁক দিতেছে। রসময়-বাবুর বয়স অনুমান পঞ্চাশ, ভারী গড়নের শরীর, মাংসল মুখ এখনও বেশ দৃঢ় আছে। আমাদের দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি উঠিবার চেষ্টা করিয়া আবার বসিয়া পড়িলেন, আমার ও ব্যোমকেশের পানে পর্যায়ক্রমে চক্ষু ফিরাইয়া দুই করতল যুক্ত করিয়া ব্যোমকেশকে বলিলেন, "আসুন ব্যোমকেশবাবু। আমি সব দিক দিয়েই বড় কাবু হয়ে পড়েছি। আপনি—আপনারা এসেছেন, আমি বাঁচলাম। বসুন, বসুন অজিতবাবু।"

আমাদের মধ্যে কে ব্যোমকেশ তাহা প্রশ্ন না করিয়াও তিনি বুঝিয়াছেন। রসময় সরকার বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমরা সোফায় পাশাপাশি বসিলাম। ব্যোমকেশ বলিল, "পায়ে বাত ধরেছে দেখছি। বাত রোগটা মারাত্মক নয়, কিন্তু বড় কষ্টদায়ক।"

রসময় বলিলেন, "আর বলবেন না। আমার শরীর বেশ ভালই,

কিন্তু এই বাতে আমাকে পঙ্গু করে ফেলেছে। ছেলেবেলায় ফুটবল খেলতাম, ডান পায়ের বুড়ো আঙুলটা ভেঙে গিয়েছিল। এখন এমন দাঁড়িয়েছে, আকাশের এক কোণে রুমালের মত এক টুকরো মেঘ উঠলে বুড়ো আঙুলে চিড়িক্ মারতে থাকে।—কিন্তু সে যাক্, বৌমা, এদের জন্যে চা নিয়ে এস।"

বধূটি এতক্ষণ হেঁটমুখে বসিয়া শ্বশুরের পায়ে সেঁক দিতেছিল। সুন্দরী মেয়ে, কিন্তু তাহার মুখে পারিবারিক বিপদের ছায়া পড়িয়াছে। সে উঠিবার উপক্রম করিতেই ব্যোমকেশ বলিল, "না না, চায়ের দরকার নেই, আমি চা খেয়ে বেরিয়েছি। উনি শ্বশুরের পদসেবা করছেন করুন।"

রসময় একটু হাসিলেন, বধূ আবার বসিয়া পড়িল। রসময় বলিলেন, "আচ্ছা, তবে থাক। মণি, সিগারেট নিয়ে এস।"

মণিময় এতক্ষণ একটা চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইয়া ছিল, সে চলিয়া গেলে রসময় বধূর পানে সস্নেহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "বড় লক্ষ্মী বৌমা আমার। গিন্নী ছোট ছেলেকে নিয়ে তীর্থদর্শনে বেরিয়েছেন, এখন ওর হাতেই সংসার। অবশ্য ওকে দিয়ে পদসেবা আমি করাই না, কিন্তু চাকরটা—"

এই পর্যন্ত বলিয়া রসময় থামিয়া গেলেন, তারপর গলার স্বর পাল্টাইয়া বলিলেন, "বাজে কথা থাক, কাজের কথা বলি। আপনি অনুগ্রহ করে এসেছেন, আপনার অমূল্য সময় নষ্ট করব না। ব্যোমকেশবাবু, কাল রাত্রে আমার বাড়িতে অঘটন ঘটে গেছে, যা কখনও হয়নি তাই হয়েছে। একটা হীরের নেকলেস—"

ব্যোমকেশ বলিল, "সব কথা গোড়া থেকে বলুন। সংক্ষেপ করবেন না। মনে করুন আমি কিছু জানি না।"

মণিময় একটি ৫৫৫ মার্কা সিগারেটের টিন ঢাকনি ঘুরাইয়া খুলিতে খুলিতে ঘরে প্রবেশ করিল, টিন আমাদের সম্মুখে রাখিয়া জানালার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। আমরা সিগারেট ধরাইলাম।

রসময়বাবু বলিতে আরম্ভ করিলেন—

"কলকাতা শহরে আমার পাঁচটা জুয়েলারির দোকান আছে। বড় কারবার, বছরে প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকার কেনা-বেচা হয়। অনেক বিশ্বাসী প্রবীণ কর্মচারী আছেন। আমার যখন শরীর ভাল থাকে আমি দেখাশোনা করি। দু' বছর থেকে মণিও যাতায়াত শুরু করেছে।

"কলকাতার বাইরে, ভারতের সর্বত্র আমাদের কাজ কারবার আছে। বোম্বাই মাদ্রাজ নয়াদিল্লি, যেখানে যত বড় জহুরী আছে, সকলের সঙ্গে আমাদের লেন-দেন। কখনও আমাদের কাছ থেকে তারা হীরে জহরত কেনে, কখনও আমরা তাদের কাছ থেকে কিনি। জহুরী ছাড়া সাধারণ খরিদ্দার ত আছেই। রাজারাজড়া থেকে ছাপোষা গৃহস্থ, সবাই আমাদের খদ্দের।

"মাসখানেক আগে দিল্লি থেকে রামদাস চোক্সী নামে একজন বড় জহুরী আমার কাছে এল। রাজস্থানের কোন্ রাজবাড়িতে মেয়ের বিয়ে, দশ লাখ টাকার গয়নার ফরমাশ পেয়েছে। কিন্তু সব গয়না সে নিজে গড়তে পারবে না, আমাকে দিয়ে একটা হীরের নেকলেস গড়িয়ে নিতে চায়। ডিজাইন দেখে, হীরে বাছাই করে দাম কষা হল। সাতান্ন হাজার টাকা। এক মাসের মধ্যে গয়না গড়ে দিল্লিতে রামদাসের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

"গয়না তৈরি হল। আমার ইচ্ছে ছিল আমি নিজেই গিয়ে গয়নাটা দিল্লিতে পৌঁছে দিয়ে আসব, কিন্তু গত মঙ্গলবার থেকে আমার বাতের ব্যথা চাগাড় দিল। কী উপায়! অত দামী গয়না কর্মচারীদের হাতে পাঠাতে সাহস হয় না। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল মণিময় যাবে আমার বদলে। আজ ওর যাবার কথা।

"আমি এ ক'দিন বাড়ি থেকে বেরুতে পারিনি, মণিই কাজকর্ম দেখছে। নেকলেসটা তৈরি হবার পর বড় দোকানের সিন্দুকে রাখা ছিল, কাল বিকেলবেলা মণি সেটা বাড়িতে নিয়ে এল।

"এখন আমার বাড়ির কথা বলি। আমার স্ত্রী ছোট ছেলে হিরণ্ময়কে নিয়ে তীর্থ করতে বেরিয়েছেন, অর্থাৎ দাক্ষিণাত্য বেড়াতে গেছেন। বাড়িতে আছি আমি, মণিময় আর বৌমা। দোতলায় থাকে দুজন চাকর, বামুন, ড্রাইভার, আর আমার খাস চাকর ভোলা। এই ক'জন নিয়ে বর্তমানে আমার সংসার।

"কাল বিকেলে মণি যখন নেকলেস নিয়ে বাড়ি এল, আমি তখন এই চেয়ারে বসে ছিলাম, আমার খাস চাকর ভোলা পায়ে মালিশ করে দিচ্ছিল। মণি নেকলেসের কেস্ আমার হাতে দিয়ে বলল, 'এই নাও বাবা।'

"আমি ভোলাকে ছুটি দিলাম, সে চলে গেল। তখন আমি কেস্ খুলে গয়নাটা পরীক্ষা করলাম। সব ঠিক আছে। তারপর বৌমাকে ডেকে বললাম, 'বৌমা, কাপড় দিয়ে এটাকে বেশ ভাল করে সেলাই করে দাও।' বৌমা এক টুকরো কাপড় এনে এখানে বসে বসে ছুঁচ-সুতো দিয়ে সেলাই করে দিলেন।"

ব্যোমকেশ এতক্ষণ মনোযোগ দিয়া শুনিতেছিল, এখন মুখ তুলিয়া বলিল, "মাফ্ করবেন, গয়নার বাক্সটা আকারে আয়তনে কত বড়?"

রসময়বাবু দ্বিধাভরে এদিক ওদিক চাহিয়া বলিলেন, "কত বড়? মোটেই বড় নয়। এই ধরুন—"

পিতা ইতস্তত করিতেছেন দেখিয়া মণিময় বইয়ের শেল্‌ফ হইতে একটি বই আনিয়া ব্যোমকেশের হাতে দিল, বলিল, "এই সাইজের বাক্স।"

রসময় বলিলেন, "হ্যাঁ, ঠিক ওই সাইজের। অবশ্য বাক্সটা কুমিরের চামড়ার, তার ভেতরে মখমলের খাঁজ-কাটা ঘর।"

বইখানা ষোলপেজী ক্রাউন সাইজের, পৃষ্ঠা-সংখ্যা আন্দাজ তিনশত। ব্যোমকেশ বইখানা মণিময়কে ফিরাইয়া দিয়া বলিল, "বুঝেছি, তারপর বলুন।"

রসময় আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন—

"তারপর মণি চা খেয়ে ক্লাবে চলে গেল। আমি গয়নার কেস্‌টা হাতে করে আবার অফিস-ঘরে গেলাম। পাশেই আমার অফিস-ঘর। বাড়িতে বসে কাজকর্ম করার দরকার হলে ওখানে বসেই করি। একটা সেক্রেটেরিয়েট্ টেবিল আছে, তার দেরাজে দরকারী কাগজপত্র থাকে। আমি গয়নার কেস্ দেরাজে রেখে দিলাম। বাড়িতে একটা লোহার সিন্দুক আছে বটে, কিন্তু গিন্নী তার চাবি নিয়ে চলে গেছেন।

"আমার অন্যায় হয়েছিল, অত বেশী দামী জিনিস খোলা-দেরাজে রাখা উচিত হয়নি। কিন্তু আমার বাড়ির যে-রকম ব্যবস্থা, তাতে আশঙ্কার কোনও কারণ ছিল না। চাকর-বাকর দোতলায় থাকে, ডেকে না পাঠালে ওপরে আসে না ; অন্য লোকেরও যাতায়াত নেই। তাই এখান থেকে গয়না চুরি যেতে পারে এ-সম্ভাবনা মনেই আসেনি।

"রাত্রি আন্দাজ ন'টার সময় আমি খাওয়া দাওয়া সেরে নিলাম। আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা অবশ্য দোতলায়, কিন্তু এই বাতের ব্যথাটা হয়ে অবধি বৌমা ওপরেই আমার খাবার এনে দেন। খাওয়া সেরে আমি একটা বই নিয়ে বসলাম, বৌমাও খেয়ে নিলেন। মণির ক্লাব থেকে ফিরতে প্রায়ই দেরি হয়, তাই তার খাবার বৌমা শোবার ঘরে ঢাকা দিয়ে রাখলেন।

"দশটার সময় আমি ভোলাকে ডাকবার জন্যে ঘন্টি বাজালাম, তারপর শুতে গেলাম। আমার বেতো শরীর, শোবার পর হাত-পা টিপে না দিলে ঘুম আসে না। ভোলাই রোজ টিপে দেয়, তারপর আমি ঘুমিয়ে পড়লে চলে যায়।

"ভোলা খুব কাজের চাকর। বছর দেড়েক আমার কাছে আছে ; জুতো বুরুস করা, কাপড়-জামা গিলে করা, ফাই-ফরমাশ খাটা, হাত-পা টেপা, সব কাজ ও করে। কাল বৌমা সদর দোর খুলে দিলেন,

ভোলা এসে আমার হাত-পা টিপে দিতে লাগল। আমি ক্রমে ঘুমিয়ে পড়লাম। তারপর সে কখন চলে গেছে জানতে পারিনি।

"হঠাৎ ঘুম ভাঙল মণির ডাকে। ও আমার বিছানার ওপর ঝুঁকে ডাকছে, 'বাবা! বাবা!' আমি ধড়মড়িয়ে উঠে বললাম, 'কী রে?' মণি বলল, 'নেকলেসটা কোথায় রেখেছেন?' আমি বললাম, 'টেবিলের দেরাজে। কেন?' ও বলল, 'কই, সেখানে ত নেই!'

"আমি ছুটে গিয়ে দেরাজ খুললাম। নেকলেসের বাক্স নেই। সব দেরাজ হাঁটকালাম। কোথাও নেই। মনের অবস্থা বুঝতেই পারছেন। মণিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুই এত রাত্রে কী করে জানলি?' সে বলল—"

ব্যোমকেশ হাত তুলিয়া রসময়কে নিবারণ করিল, মণিময়ের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "রাত্রি তখন ক'টা?"

মণিময় অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, "প্রায় বারটা। বারটা বাজতে পাঁচ মিনিট কি দশ মিনিট হবে।"

ব্যোমকেশ বলিল, "রাত বারটার সময় কোনও কারণে আপনার সন্দেহ হয়েছিল যে, নেকলেস চুরি গেছে। কী করে সন্দেহ হল সব কথা খুলে বলুন।"

মণিময় যেন আরও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল, পিতার প্রতি একটি গুপ্ত কটাক্ষপাত করিয়া ঈষৎ স্খলিত স্বরে বলিতে আরম্ভ করিল, "কাল আমার ক্লাব থেকে ফিরতে একটু বেশী দেরি হয়ে গিয়েছিল। ক্লাবে ব্রিজ-ড্রাইভ চলছে, আমি—"

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় ক্লাব? নাম কী?"

"ক্লাবের নাম—খেলাধুলো। খুব কাছেই, আমাদের বাড়ি থেকে পাঁচ মিনিটের রাস্তা। সবরকম ঘরোয়া খেলার ব্যবস্থা আছে, তাস পাশা পিংপং বিলিয়ার্ডস্। কাল ব্রিজ-ড্রাইভ্ শেষ হতে রাত হয়ে গেল—"

"আপনি হেঁটে ক্লাবে যান?"

“আজ্ঞে হ্যাঁ, খুব কাছে, তাই হেঁটেই যাই। কাল যখন ক্লাব থেকে বেরুলাম তখন পৌনে বারটা। রাত নিষুতি। আমাদের বাড়ির সদর দরজার ঠিক সামনে একটা ল্যাম্পপোস্ট আছে। আমি যখন বাড়ির প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ গজের মধ্যে এসেছি তখন দেখলাম, আশেপাশের দোকান সব বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু একটা লোক ঠিক আমাদের দোরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা বোধ হয় আমার পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছিল, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল, তারপর চট্ করে বাড়িতে ঢুকে পড়ল।

“দূর থেকে দেখে মনে হল, ভোলা চাকর। কাছে এসে দেখলাম দরজা ভেজানো রয়েছে। অন্যদিন আমি দশটা সাড়ে দশটার মধ্যে বাড়ি ফিরি, কিন্তু সদর দরজা তার আগেই বন্ধ হয়ে যায়। আজ খোলা রয়েছে। আমার খট্‌কা লাগল। সদর দরজায় হুড়কো লাগিয়ে ওপরে উঠে গেলাম। দোতলায় চাকরেরা ঘুমোচ্ছে, কারুর সাড়া শব্দ নেই।

“তেতলায় উঠতেই স্ত্রী এসে দরজা খুলে দিলেন। আপনি বোধ হয় লক্ষ্য করেছেন, তেতলার দরজায় বিলাতী গা-তালা লাগানো; ভিতর থেকে বন্ধ করে দিলে বিনা চাবিতে বাইরে থেকে খোলা যায় না। আমি স্ত্রীকে বললাম, বাড়ির সামনে একটা লোক দাঁড়িয়ে ছিল। উনি বললেন, উনিও দেখেছেন—”

“উনিও দেখেছেন?” ব্যোমকেশ বধূর পানে চোখ ফিরাইল।

বধূ লজ্জা পাইল, তাহার মুখ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। রসময় তাহাকে উৎসাহ দিয়া বলিলেন, “লজ্জা কী বৌমা? যা দেখেছ ব্যোমকেশবাবুকে বল।”

বধূ তখন লজ্জা-স্তিমিত কণ্ঠে থামিয়া থামিয়া বলিল, “কাল রাত্তিরে—আমি—ওঁর ক্লাব থেকে ফিরতে দেরি হচ্ছিল—আমি জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলুম। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার পর—হঠাৎ দেখলুম, ঠিক আমাদের দরজার সামনে ফুটপাথের ওপর কে

একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি ঝুঁকে দেখবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু ভাল দেখতে পেলুম না। তারপরেই লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেল। মনে হল দরজায় ঢুকে পড়ল।···সেই সময় দেখতে পেলুম উনি আসছেন, লোকটা যেন ওকে দেখেই ভেতরে ঢুকে পড়ল। তারপর আমি গিয়ে তেতলার দরজা খুলে দিলুম। উনি এলেন।"

ব্যোমকেশ বলিল, "লোকটাকে চিনতে পেরেছিলেন?"

বধূ মাথা নাড়িল, "না, ওপর থেকে তার মুখ দেখা যাচ্ছিল না। তবে মনে হয়েছিল, চাকরদের মধ্যেই কেউ হবে।"

"হুঁ," ব্যোমকেশ মণিময়কে বলিল, "তারপর কী হল?"

মণিময় বলিল, "স্ত্রীর কথা শুনে সন্দেহ আরও বেড়ে গেল। নেকলেসটা বিকেলবেলা এনেছি, সেটা বাবা নিশ্চয় টেবিলের দেরাজে রেখেছেন, কারণ সিন্দুকের চাবি নিয়ে মা চলে গেছেন। আমি চুপি চুপি বাবার অফিস-ঘরে গেলাম। আলো জ্বেলে দেরাজগুলো খুলে দেখলাম। নেকলেসের কেস্ নেই। আরও যেখানে যেখানে রাখা সম্ভব সব জায়গায় খুঁজলুম। কোথাও নেই। ভীষণ ভয় হল। তখন বাবাকে ডেকে তুললুম।"

মণিময় চুপ করিলে ব্যোমকেশ নিবিষ্ট মনে আর একটি সিগারেট ধরাইল, তারপর সপ্রশ্ন চক্ষে রসময়ের পানে চাহিল। রসময় আবার কাহিনীর সূত্র তুলিয়া লইলেন।—

"যখন নিঃসংশয়ে বুঝলাম নেকলেস চুরি গেছে, তখন সব সন্দেহ পড়ল ভোলার ওপর। ভেবে দেখুন, আমার তেতলার সদর-দরজায় ইয়েল লক লাগানো; ভেতর থেকে বাইরে যাওয়া সহজ, কিন্তু বাইরে থেকে ভেতরে আসা সহজ নয়। রাত্রি দশটার পর চাকরদের মধ্যে একমাত্র ভোলাই ভেতরে ছিল। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ভোলা কখন উঠে গেছে জানি না। হয়ত সে পৌনে বারটার সময় উঠে গেছে, দেরাজ থেকে নেকলেস নিয়ে চুপি চুপি বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেছে। নিচে হয়ত তার ষড়ের লোক ছিল—"

ব্যোমকেশ মণিময়কে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি একটা লোকই দেখেছিলেন ?"

মণিময় বলিল, "হ্যাঁ। দ্বিতীয় জনপ্রাণী সেখানে ছিল না।"

ব্যোমকেশ বধূর দিকে ফিরিয়া বলিল, "আপনি ?"

বধূ বলিল, "আমিও একজনকেই দেখেছিলুম। আমি সারাক্ষণ নিচের দিকেই তাকিয়ে ছিলুম, আর কেউ থাকলে দেখতে পেতুম।"

ব্যোমকেশ কিয়ৎকাল নীরবে সিগারেট টানল, শেষে রসময়কে বলিল, "তারপর আপনি কী করলেন ?"

রসময় বলিলেন, "তখন বারটা বেজে গেছে। বাপ-বেটায় পরামর্শ করে থানায় টেলিফোন করলাম। মণি নিচে নেমে গিয়ে সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল, যাতে বাড়ি থেকে কেউ বেরুতে না পারে। থানার বড় দারোগা অমরেশবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, বিশিষ্ট ভদ্রলোক। ভাগ্যক্রমে তিনি থানায় উপস্থিত ছিলেন, ফোন পেয়ে তক্ষুনি তিন-চারজন লোক নিয়ে এসে পড়লেন।

"প্রথমে দোতলার ঘরগুলো খানাতল্লাশ হল। চাকরেরা সকলেই ঘুমোচ্ছিল, ভোলাও ছিল। পুলিস তন্নতন্ন করে তল্লাশ করল, কিন্তু নেকলেস পাওয়া গেল না।

"অমরেশবাবু তখন তেতলা খানাতল্লাশ করলেন। বলা যায় না, চোর হয়ত নেকলেসটি চুরি করে এখানেই কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। পরে তাক বুঝে সরাবে। কিন্তু এখানেও নেকলেস পাওয়া গেল না।

"অমরেশবাবু তারপর ভোলাকে জেরা আরম্ভ করলেন। ভোলা স্বীকার করল, সে নিচে নেমে গিয়েছিল। সে বলল, আন্দাজ এগারটার সময় আমি ঘুমিয়ে পড়েছি দেখে সে দোতলায় নেমে যায়। অন্য চাকরেরা তখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। ভোলাও শুয়ে পড়ল, কিন্তু তার ঘুম এল না। তখন সে খোলা হাওয়ার খোঁজে নিচে নেমে গিয়ে ফুটপাথে দাঁড়াল। মণিময় যে ক্লাব থেকে ফেরেনি তা সে জানত না। সে ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেল

মণি আসছে। তখন সে তাড়াতাড়ি ফিরে এসে আবার শুয়ে পড়ল, কারণ রাত্তিরে চাকর-বাকরের বাইরে যাওয়ার কড়া বারণ আছে। এই তার বয়ান। নেকলেসের কথা সে জানে না।

"অমরেশবাবুর জেরায় আরও জানা গেল, ভোলার ছুই ভাই কলকাতায় থাকে, মেছুয়াবাজারে তাদের বাসা। ভায়েদের সঙ্গে ভোলার বিশেষ দহরম-মহরম নেই, তবে হাতে কাজ না থাকলে মাঝে মাঝে তাদের বাসায় দেখা করতে যায়।

"অমরেশবাবু যতক্ষণ ভোলাকে সওয়াল জবাব করছিলেন ততক্ষণ তাঁর সঙ্গীরা রাস্তার ছ পাশে তল্লাশ করছিল; আনাচ কানাচ ডাস্টবিন সব খুঁজে দেখছিল। মণিও তাদের সঙ্গে ছিল। কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না। এইসব ব্যাপারে ভোর হয়ে গেল, অমরেশবাবু দোতলায় একজন লোক রেখে চলে গেলেন। ভোলাকে বলে গেলেন, এবাড়ি থেকে বেরুবার চেষ্টা করলেই গ্রেপ্তার করা হবে।

"তারপর—তারপর যত বেলা বাড়তে লাগল ততই আমার মন অস্থির হয়ে উঠল। অমরেশবাবু কাজের লোক, চেষ্টার ত্রুটি করবেন না। কিন্তু আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না ব্যোমকেশবাবু। আপনাকে ফোন করলাম। আপনি আমার নেকলেস উদ্ধার করে দিন। আপনি ছাড়া এ-কাজ আর কেউ পারবে না।"

ব্যোমকেশ একটু হাসিল, "আমার ওপর আপনার এত বিশ্বাস, আশা করি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে পারব।—ভোলা চাকর ত বাড়িতেই আছে?"

"হ্যাঁ, দোতলার ঘরে আছে।"

"তাকে একবার ডেকে পাঠালে ছু-চারটে প্রশ্ন করে দেখতাম।"

"বেশ ত।" রসময় পুত্রের দিকে চাহিলেন।

মণিময় চলিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে ভোলাকে লইয়া ফিরিয়া আসিল।

ভোলা চাকরের চেহারা সাধারণ ভৃত্য শ্রেণীর লোকের চেহারা হইতে পৃথক নয়। এক জাতীয় মুখ আছে যাহা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শীর্ণ ও অস্থিসার হইয়া পড়ে, উঁচু নাক ও ছুঁচলো চিবুক প্রাধান্য লাভ করে। ভোলার মুখ সেই জাতীয়। দেহও বেউড় বাঁশের মত পাকানো ; বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। তাহার চোখের দৃষ্টিতে ভয়ের চিহ্ন নাই, কিন্তু সংযত সতর্কতা আছে।

ব্যোমকেশ তাহাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "তোমাকে দু-একটা প্রশ্ন করতে চাই।"

ভোলা সহজভাবে বলিল, "আজ্ঞে।"

"নাম কী ?"

"ভোলানাথ দাস।"

"দেশ কোথায় ?"

"মেদিনীপুর জেলায়।"

"কলকাতায় কতদিন আছ ?"

"তা পনর বছর হবে।"

"তোমার দুই ভাই কলকাতায় থাকে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, মেছোবাজারে বাসা নিয়ে এক সঙ্গে থাকে।"

"তুমি ভায়েদের সঙ্গে থাক না ?"

"আজ্ঞে, আমি যেখানে চাকরি করি সেখানেই থাকি।"

"ভায়েদের সঙ্গে বনিবনাও আছে ?"

"আজ্ঞে, বে-বনিবনাও নেই। তবে দাদারা লেখাপাড়া জানা লোক। আমি মুখ্খু—"

"তোমার দাদারা কী কাজ করে ?"

"বড়দা পোস্ট-অফিসে কাজ করে, মেজদা কর্পোরেশনের জমাদার।"

"তুমি বিয়ে করনি ?"

"করেছিলাম, বৌ মরে গেছে।"

"এ-বাড়িতে কতদিন কাজ করছ?"

"দেড় বছর।"

"তার আগে কোথায় কাজ করেছ?"

"অনেক জায়গায় কাজ করেছি।"

"কী কাজ?"

"আজ্ঞে পা-টেপা চাকরের কাজ। অন্য কাজ করবার বিদ্যে আমার নেই।"

বিদ্যা না থাক, বুদ্ধি যথেষ্ট আছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে-বুদ্ধি নিজেকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে পারে, সেই বুদ্ধি। ব্যোমকেশ আবার আরম্ভ করিল, "সকলে সন্দেহ করেন তুমিই হীরের নেকলেস চুরি করেছ।"

ভোলা চেঁচামেচি করিল না, শান্তভাবে অস্বীকার করিল, "আজ্ঞে, হীরের নেকলেস আমি চোখে দেখিনি।"

"কাল যখন মণিময়বাবু নেকলেসের বাক্স এনে রসময়বাবুকে দেন, তখন তুমি তাঁর পায়ে মালিশ করে দিচ্ছিলে।"

"একটা বাক্স এনে দিয়েছিলেন। বাক্সে কী আছে আমি জানতাম না।"

"কিছু আন্দাজ করতে পারনি? রসময়বাবু যখন বাক্স খোলবার আগে তোমাকে চলে যেতে বললেন তখনও কিছু আন্দাজ করনি?"

"আজ্ঞে না।"

ব্যোমকেশ ক্ষণেক ভ্রূকুটি করিয়া নীরব রহিল, তারপর সহসা চক্ষু তুলিয়া বলিল, "কাল সন্ধ্যের পর তুমি বাড়ি থেকে বেড়িয়ে-ছিলে?"

এতক্ষণে ভোলার চোখে একটু উদ্বেগের চিহ্ন দেখা দিল, কিন্তু সে সহজ সুরেই বলিল, "আজ্ঞে বেরিয়েছিলাম। একটা গামছা কেনবার ছিল, তাই বৌদিদির কাছে ছুটি নিয়ে বেরিয়েছিলাম।"

ব্যোমকেশ বধূর দিকে চাহিল, বধূ ঘাড় হেলাইয়া সায় দিল।

রসময়বাবুর মুখ দেখিয়া মনে হইল, তিনি এ-খবর জানিতেন না। মণিময়ও জানিত না, কারণ সে তৎপূর্বেই ক্লাবে চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু ব্যোমকেশ জানিল কী করিয়া? অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়িয়াছে?

সে ভোলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কতক্ষণ বাইরে ছিলে?"

"ঘণ্টাখানেক।"

"গামছা কিনতে এক ঘণ্টা লাগল?"

"আজ্ঞে, গামছা কিনে খানিক এদিক ওদিক ঘুরে বেড়িয়েছিলাম।"

"কারুর সঙ্গে দেখা করনি?"

"আজ্ঞে না।"

"তোমার বন্ধুবান্ধব কেউ নেই?"

"চেনাশোনা দু-চারজন আছে, বন্ধু নেই।"

"যাক।—কাল রাত্রে খাওয়া-দওয়ার পর তুমি রসময়বাবুর পা টিপে দিয়েছিলে?"

"আজ্ঞে। রোজ টিপে দিই।"

"কাল কটা অবধি পা টিপে দিয়েছিলে?"

"ঘড়ি দেখিনি। আন্দাজ এগারটা হবে।"

"তুমি যখন দোতলায় নেমে গেলে, অন্য চাকরেরা জেগে ছিল?"

"আজ্ঞে না, ঘুমিয়ে পড়েছিল।"

"কেউ জেগে ছিল না?"

"কেউ না।"

"ভারী আশ্চর্য। যা হক, তুমি তারপর কী করলে? শুয়ে পড়লে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তবে রাত বারটার সময় রাস্তায় বেরিয়েছিলে কেন?"

"অনেকক্ষণ শুয়ে শুয়ে ঘুম এল না, তখন নিচে নেমে গেলাম। ভেবেছিলাম, খোলা জায়গায় খানিক দাঁড়ালে ঘুম আসবে।"

"কতক্ষণ ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ছিলে?"

"দু-তিন মিনিটের বেশী নয়। দাদাবাবু যে কেলাব থেকে ফেরেননি তা জানতাম না। দেখলাম তিনি আসছেন, তাই তাড়াতাড়ি চলে এলাম।"

"সিঁড়ির দরজা বন্ধ করেছিলে ?"

"আজ্ঞে দাদাবাবু আসছেন, তাই বন্ধ করিনি।"

ব্যোমকেশ আর একবার ভোলার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল, বোধ করি মনে মনে তাহার স্থিরবুদ্ধির প্রশংসা করিল, তারপর শুষ্কস্বরে বলিল, "আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পার।"

ভোলা চলিয়া গেল। সদর দরজা বন্ধ করার আওয়াজ আসিলে রসময় জিজ্ঞাসুনেত্রে ব্যোমকেশের পানে চাহিলেন, "কী মনে হল ?"

ব্যোমকেশ বিমর্ষভাবে বলিল, "ভারী হুঁশিয়ার লোক। তবে কাল সন্ধ্যেবেলা যে বেরিয়েছিল, তা স্বীকার করেছে।"

"তাতে কী প্রমাণ হয় ?"

"প্রমাণ কিছুই হয় না। তবে ওর যদি কেউ ষড়ের লোক থাকে, চুরির আগে তার সঙ্গে নিশ্চয় দেখা করেছিল। নৈলে নেকলেসটা লোপাট হয়ে গেল কী করে ?"

"তা বটে।"

ভোলা সম্বন্ধে আর বেশী আলোচনা হইতে পাইল না, দ্বারে টোকা পড়ায় মণিময় চলিয়া গেল এবং অবিলম্বে পুলিস-দারোগার পোশাক-পরা এক ভদ্রলোককে লইয়া উপস্থিত হইল। লম্বা চওড়া চেহারা, ব্যক্তিত্ববান পুরুষ। দারোগা অমরেশবাবু সন্দেহ নাই।

রসময়বাবু উঠিবার উপক্রম করিয়া সবিনয়ে বলিলেন, "এ কী, অমরেশবাবু, কী খবর ! আপনি আবার এলেন যে !"

অমরেশবাবু চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া সনিশ্বাসে বলিলেন, "মেছোবাজারে গিয়েছিলাম ভোলার ভায়েদের বাসা খানাতল্লাশ করতে। কিন্তু—" এই সময় আমাদের উপর নজর পড়ায় তিনি থামিয়া গেলেন।

রসময়বাবু অপ্রতিভভাবে পরিচয় করাইয়া দিলেন, "ইন্সপেক্টর মণ্ডল, ইনি—ইয়ে—ব্যোমকেশ বক্সী। বোধ হয় নাম শুনেছেন।"

অমরেশবাবু খাড়া হইয়া বসিলেন, বিস্ময়োৎফুল্ল স্বরে বলিলেন, "বিলক্ষণ! ব্যোমকেশ বক্সীর নাম কে না শুনেছে? আপনিই! আপনার নাম প্রমোদ বরাটের কাছেও শুনেছি মশাই। প্রমোদকে মনে আছে? গোলাপ কলোনির ব্যাপারে তদন্ত করেছিল। প্রমোদ আমার বন্ধু।"

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, "প্রমোদবাবুকে খুব মনে আছে। ভারী বুদ্ধিমান লোক।"

অমরেশবাবু বলিলেন, "সে আপনার পরম ভক্ত। তার কাছে আপনার অদ্ভুত ক্ষমতার গল্প শুনেছি।—তা আপনিও এই নেকলেস চুরির ব্যাপারে আছেন নাকি? বেশ বেশ, আপনাকে পাওয়া ত ভাগ্যের কথা। প্রমোদের মুখে শুনেছি আপনার খ্যাতির লোভ নেই, কেবল সত্যান্বেষণ করেই আপনি সন্তুষ্ট। হা হা।"

ব্যোমকেশ মুখ টিপিয়া হাসিল, "ইন্সপেক্টর মণ্ডল, যার যা আছে সে তা চায় না, এই প্রকৃতির নিয়ম। এ-ব্যাপারে খ্যাতি যদি কিছু প্রাপ্য হয় আপনিই পাবেন। আমি মজুরি পেলেই সন্তুষ্ট হব।"

রসময়বাবু গাঢ়স্বরে বলিলেন, "মজুরি বলবেন না, ব্যোমকেশবাবু, সম্মান-দক্ষিণা। যদি আমার নেকলেস ফিরে পাই, আপনার সম্মান রাখতে আমি ত্রুটি করব না।"

"সে যাক," ব্যোমকেশ অমরেশবাবুর দিকে ফিরিল, "আপনি ভোলার ভায়েদের বাসা সার্চ করেছেন, কিন্তু কিছু পেলেন না?"

অমরেশবাবু বলিলেন, "কিচ্ছু পেলাম না। ওর ভায়েরা কাজে বেরিয়েছিল। দুই বৌ ঘরে ছিল। কিন্তু আতিপাতি করে খুঁজেও কিছু পাওয়া গেল না।"

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ তাঁহার পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "তাহলে আপনার সন্দেহ ভোলা তার ভায়েদের সঙ্গে ষড় করে একাজ করেছে।"

অমরেশবাবু বলিলেন, "ভায়েদের বদলে অন্য কেউ হতে পারে, কিন্তু ষড়ের লোক আছে। নৈলে নেকলেসটা লোপাট হলে গেল কী করে?"

"মণিময়বাবু এবং তাঁর স্ত্রী কিন্তু অন্য লোক দেখেন নি।"

"ওঁরা যখন ভোলাকে দেখেছেন, তার আগেই হয়ত ষড়ের লোক মাল নিয়ে সরে পড়েছে।"

"মণিময়বাবুর স্ত্রী অনেকক্ষণ ধরে জানালায় দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ষড়ের লোক এলে উনি তাকে দেখতে পেতেন না কি?"

দুইজনে কিছুক্ষণ পরস্পরের পানে চাহিয়া রহিলেন, তারপর অমরেশবাবু দ্বিধাভরে প্রশ্ন করলেন, "আপনার কি মনে হয় ভোলার কাজ নয়?"

"এখন কিছু মনে হচ্ছে না। তত্ত্বতল্লাশ যা করবার সবই আপনি করেছেন, কিছুই বাকী রাখেন নি। এখন শুধু ভেবে দেখতে হবে।" সে উঠিয়া দাঁড়াইল, "এখন উঠি। যদি ভেবে কিছু পাওয়া যায় আপনাদের জানাব।"

বাসায় ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার সন্দেহটা কার উপর?"

ব্যোমকেশ পাঞ্জাবি খুলিতে খুলিতে বলিল, "তিনজনের ওপর।"

চমকিয়া বলিলাম, "তিনজন কারা?"

"ভোলা, মণিময় এবং মণিময়ের স্ত্রী—" বলিয়া ব্যোমকেশ স্নান করিতে চলিয়া গেল।

বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম। সুযোগের দিক দিয়া তিনজনকেই

সন্দেহ করা যায়। রসময়ের দেরাজ হইতে নেকলেস সরানো তিন-জনের পক্ষেই সম্ভব। আর মোটিভ? বড়মানুষের ছেলেদের সর্বদাই টাকার দরকার। মণিময় ক্লাবে গিয়া তাস-পাশা খেলে, নিশ্চয় বাজি রাখিয়া খেলে। হয়ত অনেক টাকা দেনা হইয়াছে, ভয়ে বাপের কাছে বলিতে পারিতেছে না—

আর মণিময়ের স্ত্রী? মেয়েটি দেখিতে শান্ত শিষ্ট, কিন্তু তাহার মুখে উদ্বেগের ব্যঞ্জনা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। গহনার প্রতি স্ত্রীজাতির লোভ অবস্থা বিশেষে দুর্নিবার হইয়া উঠিতে পারে।

কিন্তু যে-ই চুরি করুক, চোরাই মাল বেমালুম সরাইয়া ফেলিল কী করিয়া?

সেদিন দুপুরবেলা ব্যোমকেশ আরামকেদারায় লম্বা হইয়া সারাক্ষণ কড়িকাঠের শোভা নিরীক্ষণ করিল, কথাবার্তা বলিল না। আপরাহ্নিক চা পানের পর হঠাৎ বলিল, "চল, একবার ঘুরে আসা যাক!"

"কোথায় ঘুরবে?"

"রসময়বাবুর বাড়ির সামনে ফুটপাথে। জায়গাটা ভাল করে দেখা হয় নি।"

পদব্রজে আমাদের বাসা হইতে রসময়বাবুর ফুটপাথে পৌঁছিতে কুড়ি মিনিট লাগিল। কাছাকাছি গিয়া ব্যোমকেশ এদিক-ওদিক চাহিতে লাগিল। বাড়ির দরজার দুই পাশে দোকানগুলি খোলা রহিয়াছে। একটি হোমিওপ্যাথি ওষুধের দোকান, একটি ঘড়ির দোকান, দুইটি বস্ত্রালয়। সব দোকানেই খরিদ্দারের যাতায়াত। ফুটপাথে পথচারীর ভিড়।

রসময়ের বাড়ির তেতলায় গোটা চারেক জানালা; উহাদেরই একটা হইতে মণিময়ের বৌ পথের পানে চাহিয়া ছিল। চোখ নামাইয়া দেখিলাম, ব্যোমকেশ হঠাৎ থামিয়া গিয়াছে এবং একদৃষ্টে রসময়ের সদর দরজার দিকে চাহিয়া আছে। তাহার দৃষ্টি অনুসরণ

করিয়া দেখিলাম, দরজা খুলিয়া মণিময় বাহির হইয়া আসিল। তাহার পরিধানে ধুতি, গেঞ্জি, হাতে একখানা খামের চিঠি। সে দরজার বাহিরে আসিয়াই পাশে দেয়ালে গাঁথা পোস্টবক্সে চিঠি ফেলিয়া দিয়া আবার ফিরিয়া যাইবার উপক্রম করিল।

"এই যে মণিময়বাবু! কাকে চিঠি লিখলেন?"

ব্যোমকেশের কণ্ঠস্বরে মণিময় চমকিয়া চাহিল। আমাদের দেখিয়া সবিনয়ে বলিল, "এ কী, আপনারা! কিছু খবর আছে নাকি?"

ব্যোমকেশ বলিল, "আমার খবর পরে দেব। আপনি কাকে চিঠি লিখলেন?"

মণিময় একটু বিষণ্ণ স্বরে বলিল, "মাকে খবরটা দিলাম। তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে লিখলাম। কিন্তু আজ আর চিঠিখানা যাবে না, ডাক বেরিয়ে গেছে। সেই কাল ভোরের ক্লিয়ারেন্সে যাবে।—কিন্তু আপনি নিশ্চয় কিছু ভাল খবর পেয়েছেন। সত্যি বলুন না।"

ব্যোমকেশ বলিল, "বাড়ি থেকে যখন বেরিয়েছিলাম তখনও কিছু খবর পাই নি, কিন্তু এখন পেয়েছি।"

"কী খবর? নেকলেসের সন্ধান পেয়েছেন?"

"পেয়েছি। সব কথা পরে বলব, এখন আমাকে একটা জরুরী কাজে যেতে হবে।"

"একবারটি ওপরে আসবেন না? বাবা আপনার কাছ থেকে খবর পাবার জন্যে অস্থির হয়ে রয়েছেন।"

ক্ষণেক চিন্তা করিয়া ব্যোমকেশ বলিল, "না, জরুরী কাজটা আগে সারতে হবে। অজিত, তুমি বরঞ্চ ওপরে যাও। রসময়বাবুকে আমার পক্ষ থেকে বলে দিও, কাল সকালে তিনি নেকলেস ফিরে পাবেন।" বলিয়া সে হনহন করিয়া চলিয়া গেল।

আমি মণিময়ের সঙ্গে উপরে গেলাম। রসময়বাবু বিলক্ষণ হতাশ

হইয়া পড়িয়াছিলেন, ব্যোমকেশের বার্তা শুনিয়া বার বার উদ্বেগভরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "সত্যি পাব ত? ঠিক পাব ত?"

আমি বললাম, "ব্যোমকেশকে কখনও মিথ্যে আশ্বাস দিতে শুনি নি। সে যখন বলেছে পাবেন তখন নিশ্চয় পাবেন।" অতঃপর চা, কেক ও ৫৫৫ নম্বর সিগারেট সেবন করিয়া ক্যাডিল্যাকে চড়িয়া গৃহে ফিরিলাম।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু ব্যোমকেশ তখনও ফেরে নাই। আরও ঘণ্টাখানেক পরে ফিরিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "গিয়েছিলে কোথায়?"

সে বলিল, "থানায়। দারোগা অমরেশবাবুর সঙ্গে দরকার ছিল।"

"কী দরকার?"

"ভীষণ দরকার। তুমি তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়, কাল সকাল সকাল উঠতে হবে।"

আমার কৌতূহল চরিতার্থ করিবার ইচ্ছা তাহার নাই দেখিয়া আমি উঠিয়া পড়িলাম। আহারে বসিলে সত্যবতী আমার মুখ লক্ষ্য করিয়া বলিল, "মুখ গোমড়া কেন?"

বলিলাম, "তোমার পতিদেবতাটি একটি কচ্ছপ।"

সত্যবতী মুখ টিপিয়া হাসিল, "এত জন্তু থাকতে কচ্ছপ কেন?"

"কচ্ছপ কথা কয় না।"

ব্যাপার বুঝিয়া সত্যবতীর মুখ সহানুভূতিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল, সে বলিল, "সত্যি বাপু। কী রাগ যে হয়। আচ্ছা, আমাদের না হয় বুদ্ধি একটু কম। তাই বলে কৌতূহল কম নয়।"

তাড়াতাড়ি খাওয়া সারিয়া শুইয়া পড়িলাম।

ঘুম ভাঙিল রাত্রিশেষে, ব্যোমকেশ ঠেলা দিয়া ঘুম ভাঙাইয়া দিল, "অজিত, ওঠ ওঠ, এখনি বেরুতে হবে।"

চা প্রস্তুত ছিল, তাড়াতাড়ি গলাধঃকরণ করিয়া ব্যোমকেশের

সহিত বাহির হইলাম। রাস্তার আলো তখনও নেভে নাই, ঘুমন্ত নগরকে সহস্রচক্ষু মেলিয়া পাহারা দিতেছে।

কোথায় চলিয়াছি তখনও জানি না; কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর বুঝিলাম, রসময়বাবুর বাড়ির দিকে যাইতেছি। জিজ্ঞাসা করিলাম, "শেষরাত্রে রসময়বাবুর সঙ্গে কী দরকার?"

সে বলিল, "রসময়বাবুর সঙ্গে দরকার নেই।"

"তবে? শেষরাত্রে বেরুবার দরকার ছিল কী?"

"ছিল। জানই ত, ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে।"

"সোজা কথা বলবে, না কেবল হেঁয়ালি করবে?"

ব্যোমকেশ মুচকি হাসিয়া বলিল, "রসময়বাবুর বাড়ির দেয়ালে যে ডাক-বাক্স আছে, তার প্রথম ক্লিয়ারেন্সের সময় হচ্ছে ভোর পাঁচটা। আজ যখন ডাক-বাক্স খোলা হবে তখন সেখানে উপস্থিত থাকতে চাই।"

মাথার মধ্যে দপদপ করিয়া কয়েকটা বাতি জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু অন্ধকার সম্পূর্ণ দূর হইল না। বলিলাম, "তাহলে— ?"

ব্যোমকেশ হাত তুলিয়া বলিল, "ধৈর্য মানো, সখা, ধৈর্য মানো।"

কয়েকটা গলিঘুঁজির ভিতর দিয়া চলিবার পর রসময়বাবুর বাড়ির সম্মুখীন হইলাম। গলি যেখানে বড় রাস্তায় মিলিয়াছে সেখানে দুটা লোক প্রচ্ছন্নভাবে দাঁড়াইয়া আছে। ব্যোমকেশ তাহাদের সহিত ফিসফিস করিয়া কথা বলিল। তারপর আমরাও গলির মুখে প্রচ্ছন্ন হইয়া দাঁড়াইলাম।

হাতঘড়িতে দেখিলাম, পাঁচটা বাজিতে দশ মিনিট। এখনও রাস্তায় লোক চলাচল আরম্ভ হয় নাই, মাঝে মাঝে সব্জি-বোঝাই ট্রাক গুরুগম্ভীর শব্দে চলিয়া যাইতেছে। রসময়বাবুর বাড়ির অভ্যন্তর অন্ধকার, সম্মুখস্থ ল্যাম্পপোস্ট বন্ধ সদর-দরজার উপর আলো ফেলিয়াছে। দরজার পাশে দেয়ালে গাঁথা ডাক-বাক্সর লাল রঙ অসংখ্য ইস্তাহারে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। ওটা যে ডাক-বাক্স, তাহা সহজে নজরে পড়ে না।

একটি একটি করিয়া মিনিট কাটিতেছে। সঞ্চরমাণ মিনিটগুলির লঘু পদধ্বনি নিজের বক্ষ-স্পন্দনে শুনিতে পাইতেছি।······পাঁচটা বাজিল ; শরীরের স্নায়ুপেশী শক্ত হইয়া উঠিল।

লোকটা কখন নিঃশব্দে ডাক-বাক্সের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। যেন ভৌতিক আবির্ভাব। গায়ে খাকি পোশাক, কাঁধে দুটো বড় বড় ঝোলা। ঝোলা দুটা ফুটপাথে নামাইয়া সে পকেট হইতে চাবির গোছা বাহির করিল, তারপর ডাক-বাক্সের তালা খুলিতে প্রবৃত্ত হইল।

ব্যোমকেশ হাত নাড়িয়া ইশারা করিল, আমরা শিকারীর মত অগ্রসর হইলাম। গলির মুখ হইতে বাহির হইয়া দেখিলাম, রাস্তার দুই দিক হইতে আরও দুই জোড়া লোক আমাদেরই মত ডাক-বাক্সের দিকে অগ্রসর হইতেছে। নিঃসন্দেহে পুলিসের লোক, কিন্তু গায়ে ইউনিফর্ম নাই।

লোকটা ডাক-বাক্সের কবাট খুলিয়াছে, আমরা গিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ধরিলাম। সে ভয়চকিতভাবে ঘাড় ফিরাইয়া আমাদের আট-জনকে দেখিয়া ত্বরিতে ঘুরিয়া দাঁড়াইল, ডাক-বাক্সের খোলা কবাট পিঠ দিয়া আড়াল করিয়া স্খলিত স্বরে বলিল, "কে ? কী চাই ?"

ব্যোমকেশ কড়া সুরে বলিল, "তোমার নাম ভূতনাথ দাস। তুমি ভোলার বড় ভাই !"

ভূতনাথ দাসের মুখখানা ভয়ে শীর্ণ-বিকৃত হইয়া গেল, চক্ষু দুটা ঠিকরাইয়া বাহির হইবার উপক্রম করিল। সে থরথর কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "কে—কে আপনারা ?"

অমরেশবাবু হুঙ্কার দিয়া বলিলেন, "আমরা পুলিস।"

অমরেশবাবু যে দলের মধ্যে আছেন তাহা প্রথম লক্ষ্য করিলাম। তিনি সামনে আসিয়া দৃঢ়ভাবে ভূতনাথের কাঁধে হাত রাখিলেন। অনুভব করিলাম, একটু নাটকীয় ভঙ্গীতে ভূতনাথকে ভয় পাওয়াইবার চেষ্টা হইতেছে। চেষ্টা ফলপ্রসূ হইল। ভূতনাথ একেবারে দিশাহারা

হইয়া গেল, হঠাৎ উগ্র তারস্বরে কাঁদিয়া উঠিল, "ওরে ভোলা, তুই আমার এ কী সর্বনাশ করলি রে! আমার চাকরি যাবে—আমি যে জেলে যাব রে!"

সে থামিতেই অপরেশবাবু তাহার কাঁধে একটা ঝাঁকানি দিয়া বলিলেন, "কোথায় রেখেছ চোরাই মাল, বের কর।"

ভূতনাথ অমরেশবাবুর পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িল, "হুজুর, ও পাপ জিনিস আমি ছুঁইনি। ডাক-বাক্সর মধ্যেই আছে।"

ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। পরশু মধ্যরাত্রি হইতে আজ সকাল পর্যন্ত নেকলেস রসময়বাবুর বাড়ির দেয়ালে গাঁথা ডাক-বাক্সের মধ্যেই আছে।

অমরেশবাবু বলিলেন, "বের কর।"

ভূতনাথ উঠিয়া ডাক-বাক্সের দিকে ফিরিল। ডাক-বাক্সে অনেক চিঠি জমা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে হাত ঢুকাইয়া বাক্সের পিছন দিকের কোণ হইতে একটি পার্সেল বাহির করিয়া আনিল। সাদা কাপড়ে সেলাই করা ক্রাউন ষোলপেজী বইয়ের মত আকার আয়তন। ভূতনাথ সেটি অমরেশবাবুর হাতে দিয়া কাতরস্বরে বলিল, "এই নিন বাবু। ধর্ম জানে এর ভেতর কী আছে, আমি চোখে দেখিনি।"

এই সময় রসময়ের সদর দরজা খুলিয়া গেল। লাঠিতে ভর দিয়া রসময় এবং তাঁহার পিছনে মণিময় ও বধূ। সকলের সদ্য-ঘুম-ভাঙা চোখে সবিস্ময় উদ্বেগ। রসময় বলিলেন, "অমরেশবাবু! ব্যোমকেশ-বাবু? কী হয়েছে? আমার নেকলেস—?"

ব্যোমকেশ অমরেশবাবুর হাত হইতে প্যাকেট লইয়া রসময়ের হাতে দিল, "এই নিন আপনার নেকলেস। খুলে দেখুন।"

বেলা আন্দাজ সাড়ে নটার সময় আমরা দুজনে আমাদের বসিবার ঘরে চৌকির উপর মুখোমুখি উপবিষ্ট ছিলাম। সত্যবতীকে

আর এক প্রস্থ চায়ের ফরমাশ দেওয়া হইয়াছে। নেকলেস-পর্বের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া চলিতেছে।

ব্যোমকেশ বলিল, "অনর্থক হয়রানি। ডাক-বাক্সটা দোরের পাশেই আছে এটা যদি প্রথমে নজরে পড়ত তাহলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে সব নিষ্পত্তি হয়ে যেত। কলকাতা শহরে দেয়ালে-গাঁথা অসংখ্য ডাক-বাক্স আছে, কিন্তু হঠাৎ চোখে পড়ে না। ডাক-বাক্সের রাঙা গায়ে ইস্তাহারের কাগজ জুড়ে তাকে প্রায় অদৃশ্য করে তুলেছে। যারা জানে তাদের কোনও অসুবিধা নেই। কিন্তু যারা জানে না তাদের পক্ষে খুঁজে বার করা মুশকিল।"

"প্রথম যখন নেকলেস চুরির বয়ান শুনলাম, তখন তিনজনের ওপর সন্দেহ হল। ভোলা, মণিময় এবং মণিময়ের স্ত্রী, এদের মধ্যে একজন চোর। কিম্বা এমনও হতে পারে যে, এই তিনজনের মধ্যে দুজন ষড় করে চুরি করেছে। মণিময় এবং ভোলার মধ্যে ষড় থাকতে পারে, আবার স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ষড় থাকতে পারে। ভোলা এবং মণিময়ের স্ত্রীর মধ্যে সাজশ থাকার সম্ভাবনাটা বাদ দেওয়া যায়।

"কিন্তু চুরি যে-ই করুক, চোরাই মাল গেল কোথায়? চুরি জানাজানি হবার এক ঘণ্টার মধ্যে পুলিস এসে বাড়ির দোতলা তেতলা খানাতল্লাশ করেছিল, কিন্তু বাড়িতে মাল পাওয়া গেল না। একমাত্র ভোলাই দুপুর রাত্রে রাস্তায় নেমেছিল। কিন্তু সে বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল, দূরে যায়নি। অন্য কোনও লোকের সঙ্গে তার দেখাও হয়নি। ভোলা যদি চুরি করে থাকে, তবে সে নেকলেস নিয়ে করল কী? মণিময় এবং তার স্ত্রীর সম্বন্ধে ওই একই প্রশ্ন— তারা গয়নাটা কোথায় লুকিয়ে রাখল?

"তিনজনের ওপর সন্দেহ হলেও প্রধান সন্দেহভাজন ব্যক্তি অবশ্য ভোলা। মণিময় যখন নেকলেস এনে বাবাকে দিল তখন সে উপস্থিত ছিল। কেসের মধ্যে দামী গয়না আছে তা অনুমান করা তার পক্ষে শক্ত নয়। সন্ধ্যের সময় সে গামছা কেনার ছুতো করে বাইরে

গিয়েছিল ; এইটেই তার সব চেয়ে সন্দেহজনক কাজ। সে যদি বাইরের লোকের সঙ্গে সাজশ করে চুরির মতলব করে থাকে তবে সহকারীকে খবর দিতে যাওয়া তার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু সে গয়না চুরি করে সহকারীকে দিল কী করে ?

"তারপর ধর মণিময়ের কথা। মনে কর, মণিময় আর তার স্ত্রীর মধ্যে সাজশ ছিল। মনে কর রাত্রি এগারটার সময় মণিময় ক্লাব থেকে বাড়ি এসেছিল, বাপের দেরাজ থেকে গয়না চুরি করে আবার বেরিয়ে গিয়েছিল ; তারপর গয়নাটা কোথাও লুকিয়ে রেখে পৌনে বারটার সময় বাড়ি ফিরে এসেছিল। অসম্ভব নয় ; কিন্তু তা যদি হত, তাহলে ভোলা কি জানতে পারত না ? জানতে পারলে সে কি চুপ করে থাকত ?"

এই সময় সত্যবতী চা লইয়া প্রবেশ করিল এবং আমাদের সামনে পেয়ালা রাখিয়া হাসি-হাসি মুখে বলিল, "এই যে, কচ্ছপের মুখে বুলি ফুটেছে দেখছি।"

ব্যোমকেশ কটমট করিয়া চাহিল। কিন্তু সত্যবতী তাহার রোষদৃষ্টি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া বলিল, "বলছ বল, এখন আমার হাত জোড়া। পরে কিন্তু আবার বলতে হবে।" বলিয়া সে চলিয়া গেল।

আমরা কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া চা পান করিলাম। কচ্ছপের উপমাটা ব্যোমকেশের পছন্দ হয় নাই, তাহা বুঝিতে কষ্ট হইল না। মনে মনে আমোদ অনুভব করিলাম। এবার সুবিধা পাইলেই তাহাকে কচ্ছপ বলিব।

যা হক, কিছুক্ষণ পরে সে আবার বলিতে আরম্ভ করিল, "মণিময় আর বৌয়ের ওপর যে সন্দেহ হয়েছিল, সেটা স্রেফ সুযোগের কথা ভেবে। মোটিভের কথা তখনও ভাবিনি। মণিময়ের মোটা টাকার দরকার হতে পারে, তার বৌয়ের গয়নার প্রতি লোভ থাকতে পারে ; কিন্তু ওদের পারিবারিক জীবন যতটা দেখলাম তাতে চুরি করার

দরকার আছে বলে মনে হয় না। রসময়বাবু স্নেহময় পিতা, স্নেহময় শ্বশুর। ছেলে এবং পুত্রবধূকে তাঁর অদেয় কিছুই নেই। যা চাইলেই পাওয়া যায় তা কেউ চুরি করে না।

"ভোলার কথা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। সুযোগ এবং মোটিভ, দু-ই তার পুরোমাত্রায় আছে। লোকটা ভারী ধূর্ত আর স্থিরবুদ্ধি। হয়ত চাকরিতে ঢুকে অবধি সে চুরির মতলব আঁটছিল এবং মনে মনে প্ল্যান ঠিক করে রেখেছিল। কাল বিকেলবেলা মস্ত দাঁও মারবার সুযোগ জুটে গেল। বাড়িতে দামী গয়না আসছে, কিন্তু গিন্নী সিন্দুকের চাবি নিয়ে তীর্থ করতে চলে গেছেন।

"ভোলার সাজশ ছিল তার বড় ভাই ভূতনাথের সঙ্গে। ভেবে দেখ কেমন যোগাযোগ। ভূতনাথ পোস্ট-অফিসে কাজ করে; তার কাজ হচ্ছে রাস্তার ধারের ডাক-বাক্স থেকে চিঠি নিয়ে ঝোলায় ভরে পোস্টঅফিসে পৌঁছে দেওয়া। হালফিল বৌবাজার এলাকায় তার কাজ; সকাল বিকেল দুপুরে তিনবার এসে সে ডাক-বাক্স পরিষ্কার করে নিয়ে যায়।

"ভোলা গামছা কেনার ছুতো করে ভূতনাথের কাছে গেল। তাকে বলে এল, সকালবেলা ডাক পরিষ্কার করতে গিয়ে সে ওই ডাক-বাক্সটার মধ্যে একটা প্যাকেট পাবে, সেটা যেন সে নিয়ে না যায়। ডাক-বাক্সতেই রেখে দেয়। তারপর পুলিসের হাঙ্গামা কেটে যাবার পর সেটা বাড়ি নিয়ে যাবে। সাধারণ ডাক-বাক্সে প্যাকেট কেউ ফেলে না, তাই প্যাকেট চিনতে কোনও কষ্ট নেই। বিশেষত এই প্যাকেটে সম্ভবত ঠিকানা লেখা থাকবে না।

"ভূতনাথ লোকটা ভালমানুষ গোছের। কিন্তু সে লোভে পড়ে গেল। লোভে পাপ পাপে মৃত্যু। চাকরি ত যাবেই, সম্ভবত শ্রীঘর বাসও হবে।

"কাল বিকেল পর্যন্ত আমি অন্ধকারে হাতড়াচ্ছিলাম। তারপর যেই দেখলাম মণিময় ডাক-বাক্সে চিঠি ফেলছে অমনি সব পরিষ্কার

হয়ে গেল। ভোলা বলেছিল তার এক ভাই পোস্ট-অফিসে চাকরি করে। কে চোর, কী করে চুরি করেছে, চোরাই মাল কোথায় আছে, কিছুই অজানা রইল না। ভোলা সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে টুক করে প্যাকেটটা ডাক-বাক্সে ফেলে আবার উপরে উঠে গিয়েছিল। হয়ত দরজার সামনে মিনিট খানেক দাঁড়িয়েছিল হাঁফ নেবার জন্যে। মণিময় যে ক্লাব থেকে ফেরেনি এবং মণিময়ের বৌ যে জানালায় দাঁড়িয়ে স্বামীর পথ চেয়ে আছে তা সে জানত না।

"আমি যখন ব্যাপার বুঝতে পারলাম, তখন সটান অমরেশবাবুর কাছে গেলাম। ভোলার দাদা ভূতনাথ কী কাজ করে, পোস্ট-অফিসে খবর নিয়ে জানা গেল। তখন বাকী রইল শুধু আসামীদের ফাঁদ পেতে ধরা এবং স্বীকারোক্তি আদায় করা।"

দরজায় ঠক্ ঠক্ শব্দ শুনিয়া দ্বার খুলিলাম। মণিময় দাঁড়াইয়া আছে। হাসিমুখে বলিল, "বাবা পাঠালেন।"

ব্যোমকেশ ভিতর হইতে বলিল, "আসুন মণিময়বাবু।"

মণিময় ভিতরে আসিয়া বসিল, পকেট হইতে একটি ছোট্ট নীল মখমলের কৌটা লইয়া ব্যোমকেশের সম্মুখে রাখিল, "বাবা এটি আপনার জন্যে পাঠালেন। তিনি নিজেই আসতেন, কিন্তু তাঁর পা—"

ব্যোমকেশ বলিল, "না না, উপযুক্ত ছেলে থাকতে তিনি বুড়ো মানুষ আসবেন কেন? তা—নেকলেস পেয়ে তিনি খুশী হয়েছেন?"

মণিময় হাসিয়া ঘাড় নাড়িল, "সে আর বলতে! তিনি আমাকে বলতে বলেছেন, এই সামান্য জিনিসটা আপনার প্রতিভার উপযুক্ত নয়, তবু আপনাকে নিতে হবে।"

"কী সামান্য জিনিস?" ব্যোমকেশ কৌটা লইয়া খুলিল; একটা মটরের মত হীরা ঝক্ঝক্ করিয়া উঠিল। হীরার আংটি। ব্যোমকেশ আংটিটা সসম্ভ্রম চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "ধন্যবাদ। আপনার

বাবাকে বলবেন আংটি আমি নিলাম। এটাকে দেখে মনে হচ্ছে আমিই এর উপযুক্ত নই। চললেন না কি? চা খেয়ে যাবেন না?"

মণিময় বলিল, "আজ একটু তাড়া আছে। ছুপুরের প্লেনে দিল্লি যেতে হবে। ফিরে এসে আর একদিন আসব, তখন চা খাব।"

মণিময় চলিয়া গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভিতর দিক হইতে সত্যবতী প্রবেশ করিল। বোধহয় পর্দার আড়ালে ছিল। ললিতকণ্ঠে বলিল, "দেখি দেখি, কী পেলে?"

ব্যোমকেশ আংটির কৌটা লুকাইয়া ফেলিবার তালে ছিল, আমি কাড়িয়া লইয়া সত্যবতীকে দিলাম। বলিলাম, "এই নাও। এটা ব্যোমকেশের প্রতিভার উপযুক্ত নয়, এবং ব্যোমকেশ এর উপযুক্ত নয়। সুতরাং এটা তোমার।"

ব্যোমকেশ বলিল, "আরে আরে, এ কী!"

আংটি দেখিয়া সত্যবতীর চক্ষু আনন্দে বিস্ফারিত হইল, "ও মা, হীরের আংটি! ভীষণ দামী আংটি! হীরেটারই দাম হাজার খানেক।" আংটি নিজের আঙুলে পরিয়া সত্যবতী ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিল, "কেমন মানিয়েছে বল দেখি!—ঐ যাঃ, মাছের ঝোল চড়িয়ে এসেছি, এতক্ষণে বোধহয় পুড়েঝুড়ে শেষ হয়ে গেল।" সত্যবতী আংটি পরিয়া চকিতে অন্তর্হিতা হইল।

ব্যোমকেশ তক্তপোশে এলাইয়া পড়িয়া গভীর নিশ্বাস মোচন করিল, বলিল, "গহনা কর্মণো গতিঃ।"

বলিলাম, "ঠিক কথা। এবং গহনার গতি গৃহিণীর দিকে।"

অমৃতের মৃত্যু

গ্রামের নাম বাঘমারি। রেল-লাইনের ধারেই গ্রাম, কিন্তু গ্রাম হইতে স্টেশনে যাইতে হইলে মাইলখানেক হাঁটিতে হয়। মাঝখানে ঘন জঙ্গল। গ্রামের লোক স্টেশন যাইবার সময় বড় একটা জঙ্গলের ভিতর দিয়া যায় না, রেল-লাইনের তারের বেড়া টপ্‌কাইয়া লাইনের ধার দিয়া যায়।

স্টেশনের নাম সান্তালগোলা। বেশ বড় স্টেশন, স্টেশন ঘিরিয়া একটি গঞ্জ গড়িয়া উঠিয়াছে। অঞ্চলটা ধান্য-প্রধান। এখান হইতে ধান-চাল রপ্তানি হয়। গোটা দুই চালের কলও আছে।

যুদ্ধের সময় একদল মার্কিন সৈন্য সান্তালগোলা ও বাঘমারির মধ্যস্থিত জঙ্গলের মধ্যে কিছুকাল ছিল; তাহারা খালি গায়ে প্যাণ্ট পরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত, চাষীদের সঙ্গে বসিয়া ডাবা-হুঁকায় তামাক খাইত। তারপর যুদ্ধের শেষে তাহারা স্বদেশে ফিরিয়া গেল, রাখিয়া গেল কিছু অবৈধ সন্তানসন্ততি এবং কিছু ক্ষুদ্রায়তন অস্ত্রশস্ত্র।

ব্যোমকেশ ও আমি যে-কর্ম উপলক্ষে সান্তালগোলায় গিয়া কিছুকাল ছিলাম তাহার সহিত উক্ত অস্ত্রশস্ত্রের সম্পর্ক আছে, তাহার বিশদ উল্লেখ যথাসময়ে করিব। উপস্থিত যে কাহিনী লিখিতেছি তাহার ঘটনাকেন্দ্র ছিল বাঘমারি গ্রাম, এবং যাহাদের মুখে কাহিনীর গোড়ার দিকটা শুনিয়াছিলাম তাহারা এই গ্রামেরই ছেলে। বাক্‌বাহুল্য বর্জনের জন্য তাহাদের মুখের কথাগুলি সংহত আকারে লিখিতেছি।

বাঘমারি গ্রামে যে কয়টি কোঠাবাড়ি আছে তন্মধ্যে সদানন্দ সুরের বাড়িটা সবচেয়ে পুরাতন। গুটিতিনেক ঘর, সামনে শান-বাঁধানো

চাতাল, পিছনে পাঁচিল-ঘেরা উঠান। বাড়ির ঠিক পিছন হইতে জঙ্গল আরম্ভ হইয়াছে।

সদানন্দ স্থূর বয়স্ক ব্যক্তি, কিন্তু তাঁহার জ্ঞাতি-গোষ্ঠী স্ত্রী-পুত্র কেহ নাই, একলাই পৈতৃক ভিটায় থাকেন। তাঁহার একটি বিবাহিতা ভগিনী আছে বটে, স্বামী রেলের চাকরি করে, কিন্তু তাহারা শহুরে লোক, তাহাদের সহিত সদানন্দবাবুর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা নাই। গ্রামের লোকের সঙ্গেও তাঁহার সম্পর্ক খুব গাঢ় নয়, কাহারও সহিত অসদ্ভাব না থাকিলেও বেশী মাখামাখিও নাই। বেশীর ভাগ দিন সকালবেলা উঠিয়া তিনি স্টেশনের গঞ্জে চলিয়া যান, সন্ধ্যার সময় গ্রামে ফিরিয়া আসেন। তিনি কী কাজ করেন সে সম্বন্ধে কাহারও মনে খুব স্পষ্ট ধারণা নাই। কেহ বলে ধান-চালের দালালি করেন, কেহ বলে বন্ধকী কারবার আছে। মোটের উপর লোকটি অত্যন্ত সংবৃতমন্ত্র ও মিতব্যয়ী, ইহার অধিক তাঁহার বিষয়ে বড় কেহ কিছু জানে না।

একদিন চৈত্রমাসের ভোরবেলা সদানন্দ বাড়ি হইতে বাহির হইলেন ; একটি মাঝারি আয়তনের ট্রাঙ্ক ও একটি ক্যাম্বিসের ব্যাগ বাহিরে রাখিয়া দরজায় তালা লাগাইলেন। তারপর ব্যাগ ও ট্রাঙ্ক দুই হাতে ঝুলাইয়া যাত্রা করিলেন।

বাড়ির সামনে মাঠের মতো খানিকটা খোলা জায়গা। সদানন্দ মাঠ পার হইয়া রেল-লাইনের দিকে চলিয়াছেন, গ্রামের বৃদ্ধ হীরু মোড়লের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। হীরু বলিল,—'কী গো কত্তা, সকালবেলা বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে কোথায় চলেছেন ?'

সদানন্দ থামিলেন,—'দিন কয়েকের জন্য বাইরে যাচ্ছি।'

হীরু বলিল,—'অ। তিত্থিধম্ম করতে চললেন নাকি ?'

সদানন্দ শুধু হাসিলেন। হীরু বলিল,—'ইরির মধ্যে তিত্থিধম্ম ? বয়স কত হ'ল কত্তা ?'

'পঁয়তাল্লিশ।' সদানন্দ আবার চলিলেন।

হীরু পিছন হইতে ডাক দিয়া প্রশ্ন করিল,—'ফিরছেন কদ্দিনে ?'

'দিন ছ'সাতের মধ্যেই ফিরব।'

সদানন্দ চলিয়া গেলেন।

তাঁহার আকস্মিক তীর্থযাত্রা লইয়া গ্রামে একটু আলোচনা হইল। তাঁহার প্রাণে যে ধর্মকর্মের প্রতি আসক্তি আছে এ সন্দেহ কাহারও ছিল না। গত দশ বৎসরের মধ্যে এক রাত্রির জন্যও তিনি বাহিরে থাকেন নাই। সকলে আন্দাজ করিল নীরব-কর্মা সদানন্দ স্থূর কোনও মতলবে বাহিরে গিয়াছেন।

ইহার দিন তিন চার পরে সদানন্দের বাড়ির সামনের মাঠে গ্রামের ছেলে-ছোকরারা বসিয়া জটলা করিতেছিল। গ্রামে পঁচিশ-ত্রিশ ঘর ভদ্রশ্রেণীর লোক বাস করে ; সন্ধ্যার পর তরুণ-বয়স্কেরা এই মাঠে আসিয়া বসে, গল্পগুজব করে, কেহ গান গায়, কেহ বিড়ি-সিগারেট টানে। শীত এবং বর্ষাকাল ছাড়া এই স্থানটাই তাহাদের আড্ডাঘর।

আজ অমৃত নামধারী জনৈক যুবককে সকলে মিলিয়া ক্ষেপাইতেছিল। অমৃত গাঁয়ের একটি ভদ্রলোকের অনাথ ভাগিনেয়, একটু আধ-পাগলা গোছের ছেলে। রোগা তালপাতার সেপাইয়ের মতো চেহারা, তড়বড় করিয়া কথা বলে, নিজের সাহস ও বুদ্ধিমত্তা প্রমাণের জন্য সর্বদাই সচেষ্ট। তাই সুযোগ পাইলে সকলেই তাহাকে লইয়া একটু রঙ্গ-তামাশা করে।

সকালের দিকে একটা ব্যাপার ঘটিয়াছিল।—নাড়ু নামক এক যুবকের সম্প্রতি বিবাহ হইয়াছে ; তাহার বৌয়ের নাম পাপিয়া। বৌটি সকালবেলা কলসী লইয়া পুকুরে জল আনিতে যাইতেছিল, ঘাটে অন্য মেয়েরাও ছিল। অমৃত পুকুরপাড়ে বসিয়া খোলামকুচি দিয়া জলের উপর ব্যাঙ-লাফানো খেলিতেছিল ; নাড়ুর বৌকে দেখিয়া তাহার কি মনে হইল, সে পাপিয়ার স্বর অনুসরণ করিয়া ডাকিয়া উঠিল—'পিউ পিউ—পিয়া পিয়া পাপিয়া—'

মেয়েরা হাসিয়া উঠিল। বৌটি অপমান বোধ করিয়া তখনই গৃহে ফিরিয়া গেল এবং স্বামীকে জানাইল। নাহু অগ্নিশর্মা হইয়া লাঠি হাতে ছুটিয়া আসিল। তাহাকে দেখিয়া অমৃত পুকুরপাড়ের একটা নারিকেল গাছে উঠিয়া পড়িল। তারপর গাঁয়ের মাতব্বর ব্যক্তিরা আসিয়া শান্তিরক্ষা করিলেন। অমৃতের মনে যে কু-অভিপ্রায় ছিল না তাহা সকলেই জানিত, গোঁয়ার-গোবিন্দ নাহুও বুঝিল। ব্যাপার বেশীদূর গড়াইতে পাইল না।

কিন্তু অমৃত তাহার সমবয়স্কদের শ্লেষ-বিদ্রূপ হইতে নিস্তার পাইল না। সন্ধ্যার সময় সে মাঠের আড্ডায় উপস্থিত হইতেই সকলে তাহাকে ছাঁকিয়া ধরিল।

পটল বলিল,—'হ্যাঁরে অমর্ত, তুই এতবড় বীর, নাহুর সঙ্গে লড়ে যেতে পারলি না? নারকেল গাছে উঠলি!'

অমৃত বলিল,—'হুঁঃ, আমি তো ডাব পাড়তে উঠেছিলাম। নেদোকে আমি ডরাই না, ওর হাতে যদি লাঠি না থাকত অ্যায়সা লেঙ্গি মারতাম যে বাছাধনকে বিছানায় পড়ে কোঁ-কোঁ করতে হ'ত!'

গোপাল বলিল,—'সাবাস! বাড়ি গিয়ে মামার কাছে খুব ঠেঙানি খেয়েছিলি তো?'

অমৃত হাত মুখ নাড়িয়া বলিল,—'মামা মারেনি, মামা আমাকে ভালবাসে। শুধু মামী কান মলে দিয়ে বলেছিল—তুই একটা গো-ভূত।'

সকলে হি-হি করিয়া হাসিল। পটল বলিল,—'ছি ছি, তুই এমন কাপুরুষ! মেয়েমানুষের হাতের কানমলা খেলি?'

অমৃত বলিল,—'মামী গুরুজন, তাই বেঁচে গেল, নইলে দেখে নিতাম। আমার সঙ্গে চালাকি নয়।'

দাশু বলিল,—'আচ্ছা অম্‌রা, তুই তো মানুষকে ভয় করিস না। সত্যি বল দেখি, ভূত দেখলে কি করিস?'

একজন নিম্নস্বরে বলিল,—'কাপড়ে-চোপড়ে—'

অমৃত চোখ পাকাইয়া বলিল,—'ভূত আমি দেখেছি কিন্তু মোটেই ভয় পাইনি।'

সকলে কলরব করিয়া উঠিল,—'ভূত দেখেছিস? কবে দেখলি? কোথায় দেখলি?'

অমৃত সগর্বে জঙ্গলের দিকে শীর্ণ বাহু প্রসারিত করিয়া বলিল,—'ঐখানে।'

'কবে দেখেছিস? কী দেখেছিস?'

অমৃত গম্ভীর স্বরে বলিল,—'ঘোড়া-ভূত দেখেছি।'

দু'একজন হাসিল। গোপাল বলিল,—'তুই গো-ভূত কিনা, তাই ঘোড়া-ভূত দেখেছিস। কবে দেখলি?'

'পরশু রাত্তিরে।' অমৃত পরশু রাত্রের ঘটনা বলিল,—'আমাদের কৈলে বাছুরটা দড়ি খুলে গোয়ালঘর থেকে পালিয়েছিল। মামা বললে, যা অম্‌রা, জঙ্গলের ধারে দেখে আয়। রাত্তির তখন দশটা; কিন্তু আমার তো ভয়-ডর নেই, গেলাম জঙ্গলে। এদিক ওদিক খুঁজলাম, কিন্তু কোথায় বাছুর! চাঁদের আলোয় জঙ্গলের ভেতরটা হিলি-বিলি দেখাচ্ছে—হঠাৎ দেখি একটা ঘোড়া। খুরের শব্দ শুনে ভেবেছিলাম বুঝি বাছুরটা; ঘাড় ফিরিয়ে দেখি একটা ঘোড়া বনের ভেতর দিয়ে সাঁ করে চলে গেল। কালো কুচকুচে ঘোড়া, নাক দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে। আমি রামনাম করতে করতে ফিরে এলাম। রামনাম জপ্‌লে ভূত আর কিছু করতে পারে না।'

দাশু জিজ্ঞাসা করিল,—'কোন্ দিক থেকে কোন্ দিকে গেল ঘোড়া-ভূত?'

'গাঁয়ের দিক থেকে ইস্টিশানের দিকে।'

'ঘোড়ার পিঠে সওয়ার ছিল?'

'অত দেখিনি।'

সকলে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। ভূতের গল্প বানাইয়া বলিতে পারে এত কল্পনাশক্তি অমৃতের নাই। নিশ্চয় সে জ্যান্ত ঘোড়া

দেখিয়াছিল। কিন্তু জঙ্গলে ঘোড়া আসিল কোথা হইতে? গ্রামে কাহারও ঘোড়া নেই। যুদ্ধের সময় যে মার্কিন সৈন্য জঙ্গলে ছিল তাহাদের সঙ্গেও ঘোড়া ছিল না। ইস্টিশানের গঞ্জে দুই-চারিটা ছ্যাকড়া-গাড়ীর ঘোড়া আছে বটে। কিন্তু ছ্যাকড়া-গাড়ীর ঘোড়া রাত্রিবেলা জঙ্গলে ছুটাছুটি করিবে কেন? তবে কি অমৃত পলাতক বাছুরটাকেই ঘোড়া বলিয়া ভুল করিয়াছিল?

অবশেষে পটল বলিল,—'বুঝেছি, তুই বাছুর দেখে ঘোড়া-ভূত ভেবেছিলি।'

অমৃত সজোরে মাথা ঝাঁকাইয়া বলিল,—'না না, ঘোড়া। জল-জ্যান্ত ঘোড়া-ভূত আমি দেখেছি।'

'তুই বলতে চাস্ ঘোড়া-ভূত দেখেও তোর দাঁত-কপাটি লাগেনি?'

'দাঁত-কপাটি লাগবে কেন? আমি রামনাম করেছিলাম।'

'রামনাম করেছিলি বেশ করেছিলি। কিন্তু ভয় পেয়েছিলি বলেই না রামনাম করেছিলি?'

'মোটেই না, মোটেই না'—অমৃত আস্ফালন করিতে লাগিল,—'কে বলে আমি ভয় পেয়েছিলাম! ভয় পাবার ছেলে আমি নয়।'

দাশু বলিল,—'দ্যাখ্ অম্‌রা, বেশী বড়াই করিস নি। তুই এখন জঙ্গলে যেতে পারিস?'

'কেন পারব না!' অমৃত ঈষৎ শঙ্কিতভাবে জঙ্গলের দিকে তাকাইল। ইতিমধ্যে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া চাঁদের আলো ফুটিয়াছে, জঙ্গলের গাছগুলা ঘনকৃষ্ণ ছায়া রচনা করিয়াছে; অমৃত একটু থামিয়া গিয়া বলিল,—'ইচ্ছে করলেই যেতে পারি, কিন্তু যাব কেন? এখন তো আর বাছুর হারায় নি।'

গোপাল বলিল,—'বাছুর না হয় হারায় নি। কিন্তু তুই গুল মারছিস কিনা বুঝব কি করে?'

অমৃত লাফাইয়া উঠিল,—'গুল মারছি! আমি গুল মারছি! দ্যাখ্ গোপ্‌লা, তুই আমাকে চিনিস না—'

'বেশ তো, চিনিয়ে দে। যা দেখি একলা জঙ্গলের মধ্যে। তবে বুঝব তুই বাহাদুর।'

অমৃত আর পারিল না, সদর্পে বলিল,—'যাচ্ছি—এক্ষুনি যাচ্ছি। আমি কি ভয় করি নাকি?' সে জঙ্গলের দিকে পা বাড়াইল।

পটল তাহাকে ডাকিয়া বলিল,—'শোন্, এই খড়ি নে। বেশীদূর তোকে যেতে হবে না, সদানন্দদা'র বাড়ির পিছনে যে বড় শিমুলগাছটা আছে তার গায়ে খড়ি দিয়ে ঢ্যারা মেরে আসবি। তবে বুঝব তুই সত্যি গিয়েছিলি।'

খড়ি লইয়া ঈষৎ কম্পিতকণ্ঠে অমৃত বলিল,—'তোরা এখানে থাকবি তো?'

'থাকব।'

অমৃত জঙ্গলের দিকে পা বাড়াইল। যতই অগ্রসর হইল ততই তাহার গতিবেগ হ্রাস হইতে লাগিল। তবু শেষ পর্যন্ত সে সদানন্দ সুরের বাড়ির আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

মাঠে উপবিষ্ট ছোকরার দল পাণ্ডুর জ্যোৎস্নার ভিতর দিয়া নীরবে জঙ্গলের দিকে চাহিয়া রহিল। একজন বিড়ি ধরাইল। একজন হাসিল,—'অম্‌রা হয়তো সদানন্দদা'র বাড়ির পাশে ঘাপ্‌টি মেরে বসে আছে।'

কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। সকলের দৃষ্টি জঙ্গলের দিকে।

হঠাৎ জঙ্গল হইতে চড়াৎ করিয়া একটা শব্দ আসিল। শুক্‌নো গাছের ডাল ভাঙিলে যেরূপ শব্দ হয় অনেকটা সেইরূপ। সকলে চকিত হইয়া পরস্পরের পানে চাহিল।

আরও কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। কিন্তু অমৃত ফিরিয়া আসিল না। অমৃত যেখানে গিয়াছে, ছোকরাদের দল হইতে সেই শিমুলগাছ বড়জোর পঞ্চাশ-ষাট গজ। তবে সে ফিরিতে এত দেরি করিতেছে কেন!

আরও তিন চার মিনিট অপেক্ষা করিবার পর পটল উঠিয়া

দাঁড়াইয়া বলিল,—'চল্ দেখি গিয়ে। এত দেরি করছে কেন অম্‌রা!'

সকলে দল বাঁধিয়া যে-পথে অমৃত গিয়াছিল সেই পথে চলিল। একজন রহস্য করিয়া বলিল,—'অম্‌রা ঘোড়া-ভূতের পিঠে চড়ে পালাল নাকি?'

অম্‌রা কিন্তু পালায় নাই। সদানন্দ সুরের বাড়ির খিড়কি হইতে বিশ-পঁচিশ গজ দূরে শিমুলগাছ। সেখানে জ্যোৎস্না-বিদ্ধ অন্ধকারে সাদারঙের কি একটা পড়িয়া আছে। সকলে কাছে গিয়া দেখিল—অমৃত।

একজন দেশলাই জ্বালিল। অমৃত চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে, তাহার বুকের জামা রক্তে ভিজিয়া উঠিয়াছে।

অমৃত ভূতের ভয়ে মরে নাই, বন্দুকের গুলীতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

দুই

ব্যোমকেশ আমাকে লইয়া সাস্তালগোলায় আসিয়াছিল একটা সরকারী তদন্ত উপলক্ষে। সরকারের বেতনভুক পুলিস-কর্মচারীরা ব্যোমকেশকে স্নেহের চোখে দেখেন না বটে, কিন্তু মন্ত্রিমহলে তাহার খাতির আছে। পুলিসের জবাব দেওয়া কেস্ মাঝে মাঝে তাহার ঘাড়ে আসিয়া পড়ে।

গত মহাযুদ্ধের সময় অনেক বিদেশী সৈন্য আসিয়া এদেশের নানা স্থানে ঘাঁটি গাড়িয়া বসিয়াছিল; তারপর যুদ্ধের শেষে বিদেশীরা চলিয়া গেল, দেশে স্বদেশী শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইল। স্বাধীনতার রক্ত-স্নান শেষ করিয়া দেশ যখন মাথা তুলিল তখন দেখিল হ্রদের উপরিভাগ শান্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু তলদেশে হিংস্রক নক্রকুল

ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বিদেশী সৈন্যদলের ফেলিয়া-যাওয়া অস্ত্রশস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে এই নক্রকুলের নখদন্ত। রেলের দুর্ঘটনা, আকস্মিক বোমা-বিস্ফোরণ, সশস্ত্র ডাকাতি—নূতন শাসনতন্ত্রকে উদ্‌ব্যস্ত করিয়া তুলিল।

পুলিস তদন্তে দু'চারজন দুর্বৃত্ত ধরা পড়িলেও, বোমা পিস্তল প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্র কোথা হইতে সরবরাহ হইতেছে তাহার হদিস মিলিল না। বিদেশী সিপাহীরা যেখানে যেখানে ঘাঁটি গাড়িয়াছিল, অস্ত্রগুলি যে তাহার কাছেপিঠেই সঞ্চিত হইয়াছে তাহা অনুমান করা শক্ত নয়; কিন্তু আসল সমস্যা দাঁড়াইয়াছিল অস্ত্র-সরবরাহকারী লোকগুলাকে ধরা। যাহারা অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্রের কালাবাজার চালাইতেছে তাহাদের ধরিতে না পারিলে এ উৎপাতের মূলোচ্ছেদ হইবে না।

সরকারী দপ্তরের সহিত পরামর্শ করিয়া ব্যোমকেশ প্রথমে সান্তালগোলায় আসিয়াছে। স্থানটি ছোট, কোনও অবস্থাতেই তাহাকে শহর বলা চলে না। স্টেশনের কাছে রেল-কর্মচারীদের একসারি কোয়ার্টার। একটি পাকা রাস্তা স্টেশনকে স্পর্শ করিয়া দুই দিকে মোড় ঘুরিয়া গিয়াছে এবং কুড়ি পঁচিশ বিঘা জমিকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে; এই স্থানটুকুর মধ্যে কয়েকটা বড় বড় আড়ত, পুলিস থানা, পোস্ট অফিস, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, সরকারী বিশ্রান্তিগৃহ ইত্যাদি আছে। যে দুটি চাল-কলের উল্লেখ পূর্বে করিয়াছি সে দুটি এই রাস্তা-ঘেরা স্থানের দুই প্রান্তে অবস্থিত। স্থানীয় লোক অধিকাংশ বাঙালী হইলেও, মাড়োয়ারী ও হিন্দুস্থানী যথেষ্ট আছে।

আমরা সরকারী বিশ্রান্তিগৃহে আড্ডা গাড়িয়াছিলাম। ব্যোমকেশের এখানে আত্মপরিচয় দিবার ইচ্ছা ছিল না, এ ধরনের তদন্তে যতটা প্রচ্ছন্ন থাকা যায় ততই সুবিধা; কিন্তু আসিয়া দেখিলাম ব্যোমকেশের পরিচয় ও আগমনের উদ্দেশ্য কাহারও অবিদিত নাই। স্থানীয় পুলিস দারোগা সুখময় সামন্ত পুলিস বিভাগ হইতে

ব্যোমকেশ সম্বন্ধে পূর্ব হইতেই ওয়াকিবহাল ছিলেন, তাঁহার কৃপায় ব্যোমকেশের খ্যাতি দিকে দিকে ব্যাপ্ত হইয়াছে।

দারোগা সুখময়বাবুর মুখ ভারি মিষ্ট, কিন্তু মস্তিষ্কটি দুষ্টবুদ্ধিতে ভরা। তিনি প্রকাশ্যে ব্যোমকেশকে সাহায্য করিতেছিলেন এবং অপ্রকাশ্যে যত ভাবে সম্ভব বাগড়া দিতেছিলেন। পুলিস যেখানে ব্যর্থ হইয়াছে, একজন বাহিরের লোক আসিয়া সেখানে কৃতকার্য হইবে, ইহা বোধহয় তাঁহার মনঃপূত হয় নাই।

যাহোক, বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও ব্যোমকেশ কাজ আরম্ভ করিল। পরিচয় গোপন রাখা সম্ভব নয় দেখিয়া প্রকাশ্যভাবেই অনুসন্ধান শুরু করিল। খোলাখুলি থানায় গিয়া দারোগা সুখময়বাবুর নিকট হইতে স্থানীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তির নামের তালিকা সংগ্রহ করিল। স্টেশনে গিয়া মাস্টার, মালবাবু, টিকিট-বাবু, চেকার প্রভৃতির সহিত ভাব জমাইল; কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে গিয়া ম্যানেজারের নিকট হইতে স্থানীয় বিত্তবান ব্যক্তিদের খোঁজখবর হইল। সকলেই জানিতে পারিয়াছিল ব্যোমকেশ কি জন্য আসিয়াছে, তাই সকলে সহযোগিতা করিলেও বিশেষ কোনও ফল হইল না।

চার পাঁচ দিন বৃথা ঘোরাঘুরির পর ব্যোমকেশ এক মতলব বাহির করিল। স্থানীয় যে-কয়জন বর্ধিষ্ণু লোককে সন্দেহ করা যাইতে পারে তাহাদের বেনামী চিঠি লিখিল। চিঠির মর্ম: আমি তোমার গোপন কার্যকলাপ জানিতে পারিয়াছি, শীঘ্রই দেখা হইবে।—চিঠিগুলি আমি দুই-তিন স্টেশন দূরে জংশনে গিয়া ডাকে দিয়া আসিলাম।

চার ফেলিয়া বসিয়া আছি, কিন্তু মাছের দেখা নাই। এইভাবে আরও দুই তিন দিন কাটিয়া গেল। নিষ্কর্মার মতো দিনে রাত্রে ঘুমাইয়া ও দুই সন্ধ্যা ভ্রমণ করিয়া স্বাস্থ্যের বেশ উন্নতি হইতে লাগিল। কিন্তু কাজের সুরাহা হইল না।

তারপর একদিন সকালবেলা বাঘমারি গ্রাম হইতে তিনটি ছেলে আসিয়া উপস্থিত হইল।

বেলা আন্দাজ আটটার সময় গরম জিলাপী সহযোগে গরম দুগ্ধ সেবন করিয়া অভ্যন্তরভাগে বেশ একটি তৃপ্তিকর পরিপূর্ণতা অনুভব করিতেছি এমন সময় দ্বারের কাছে কয়েকটি মুণ্ড উঁকিঝুঁকি মারিতেছে দেখিয়া ব্যোমকেশ বাহিরে আসিল,—'কি চাই ?'

বিশ্রান্তিগৃহে পাশাপাশি দুটি ঘর, সামনে ঢাকা বারান্দা। তিনটি যুবক বারান্দায় উঠিয়া ইতস্তত করিতেছিল, ব্যোমকেশকে দেখিয়া যুগপৎ দন্তবিকাশ করিল। একজন সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল,—'আপনিই ব্যোমকেশবাবু ?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'হ্যাঁ।'

যুবকদের দন্তবিকাশ কর্ণচুম্বী হইয়া উঠিল। একজন বলিল,—'আমরা বাঘমারি গ্রাম থেকে আসছি।'

'বাঘমারি গ্রাম! সে কোথায় ?'

'আজ্ঞে বেশী দূর নয়, এখান থেকে মাইলখানেক।'

'আসুন'—বলিয়া ব্যোমকেশ তাহাদের ঘরে লইয়া আসিল। বিশ্রান্তিগৃহের বাঁধা-বরাদ্দ আসবাব—একটি চেয়ার, একটি টেবিল, একটি আরামকেদারা, দুটি খাট, মেঝেয় নারিকেল-ছোবড়ার চাটাই পাতা। যুবকেরা দুইজন মেঝেয় বসিল, একজন টেবিলে উঠিয়া বসিল। ব্যোমকেশ আরামকেদারায় অর্ধশয়ান হইয়া বলিল,—'কী ব্যাপার বলুন দেখি ?'

যে ছোকরা অগ্রণী হইয়া কথা বলিতেছিল তাহার নাম পটল। অন্য দুজনের নাম দাশু ও গোপাল। পটল বলিল,—'আপনি শোনেননি! আমাদের গ্রামে একটা ভীষণ হত্যাকাণ্ড হয়ে গেছে।'

'বলেন কি! কবে ?' ব্যোমকেশ আরামকেদারায় উঠিয়া বসিল।

দাশু ও গোপাল একসঙ্গে বলিয়া উঠিল,—'পরশু সন্ধ্যের পর।'

পটল বলিল,—'পুলিসে তক্ষুনি খবর দেওয়া হয়েছিল। কাল সকালে বেলা ন'টার সময় দারোগা সুখময় সামন্ত গিয়েছিল। লাশ নিয়ে চলে এসেছিল, তারপর আর কোনও খবর নেই। আজ আমরা আপনার কাছে আসবার আগে থানায় গিয়েছিলাম, সুখময় দারোগা আমাদের হাঁকিয়ে দিলে। লাশ নাকি সদরে পাঠানো হয়েছে, হাসপাতালে চেরা-ফাঁড়া হবে। আপনি এসব কিছুই জানেন না? তবে যে শুনেছিলাম আপনি পুলিসকে সাহায্য করবার জন্য এখানে এসেছেন!'

ব্যোমকেশ শুষ্কস্বরে বলিল,—'দারোগাবাবু বোধহয় এ খবর আমাকে দেওয়া দরকার মনে করেননি। সে যাক। কে কাকে খুন করেছে? কী দিয়ে খুন করেছে?'

পটল বলিল—'বন্দুক দিয়ে। খুন হয়েছে আমাদের এক বন্ধু—অমৃত। কে খুন করেছে তা কেউ জানে না। ব্যোমকেশবাবু, অমৃতার মৃত্যুর জন্য আমরাও খানিকটা দায়ী, ঠাট্টা-তামাশা করতে গিয়ে এই সর্বনাশ হয়েছে। তাই আমরা আপনার কাছে এসেছি। সুখময় দারোগার দ্বারা কিছু হবে না, আপনি দয়া করে খুঁজে বার করুন কে খুন করেছে। আমরা আপনার কাছে চিরঋণী হয়ে থাকব।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'বন্দুক দিয়ে খুন হয়েছে! আশ্চর্য!—সব কথা খুলে বলুন।'

অতঃপর পটল, দাশু ও গোপাল মিলিয়া কখনও একসঙ্গে কখনও পর্যায়ক্রমে যে কাহিনী বলিল তাহা পূর্বে বিবৃত হইয়াছে। অমৃতের মৃত্যুতে তাহারা খুব কাতর হইয়াছে এমন মনে হইল না, কিন্তু অমৃতের রহস্যময় মৃত্যু তাহাদের উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে। এবং ব্যোমকেশকে হাতের কাছে পাইয়া এই উত্তেজনা নাটকীয় রূপ ধারণ করিয়াছে।

অমৃতের মৃত্যু-বিবরণ শেষ হইতে আন্দাজ দু'ঘণ্টা লাগিল;

ব্যোমকেশ মাঝে মাঝে প্রশ্ন করিয়া অস্পষ্ট স্থান পরিষ্কার করিয়া লইল। শেষে বলিল,—'ঘটনা রহস্যময় বটে, তার ওপর বন্দুক। —কিন্তু শুধু গল্প শুনলে কাজ হবে না, জায়গাটা দেখতে হবে।'

তিনজনেই উৎসাহিত হইয়া উঠিল। পটল বলিল,—'বেশ তো, এখুনি চলুন না, ব্যোমকেশবাবু। আপনি আমাদের গ্রামে যাবেন সে তো ভাগ্যের কথা।'

ব্যোমকেশ হাতের ঘড়ি দেখিয়া বলিল,—'এ-বেলা থাক। দু'দিন যখন কেটে গেছে তখন একবেলায় বিশেষ ক্ষতি হবে না। আমরা ও-বেলা পাঁচটা নাগাদ যাব।'

'বেশ, আমরা এসে আপনাকে নিয়ে যাব।'

তাহারা চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে দারোগা সুখময়বাবু আসিলেন। চেয়ারে নিজের সুবিপুল বপুখানি ঠাসিয়া দিয়া বলিলেন,—'বাঘমারির ছোঁড়াগুলো এসেছিল তো? আমার কাছেও গিয়েছিল। বাঙালীর ছেলে, একটা হুজুগ পেয়েছে, আর কি রক্ষে আছে! আপনি ওদের আমল দেবেন না মশাই, আপনার প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলবে।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'না না, আমল দেব কেন? আপনি তো ওদের আগে থাকতেই চেনেন, কেমন ছেলে ওরা?'

সুখময়বাবু বলিলেন,—'পাড়াগাঁয়ের বকাটে নিষ্কর্মা ছেলে, আর কি। বাপের দু'বিঘে ধান-জমি আছে, কি তিনটে গাছ আছে, ব্যস্, ঘরে বসে-বসে বাপের অন্ন ধ্বংস করছে।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'যে ছেলেটা মারা গেছে সেও তো ওদেরই দলের ছেলে।'

'হ্যাঁ, সে ছিল আবার এককাটি বাড়া। মামার ভাতে ছিল, বকামি করে বেড়াতো।'

'বন্দুকের গুলীতে মরেছে শুনলাম।'

'তাই মনে হয়, তবে ময়না তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত কিছুই বলা যায় না।'

'হুঁ। কে মেরেছে কিছু সন্দেহ করেন?'

'কি করে সন্দেহ করব বলুন দেখি? কেউ কিছু চোখে দেখেনি, সবাই একজোট হয়ে মাঠে আড্ডা দিচ্ছিল। তবে একটা ব্যাপারের জন্যে একজনের ওপর সন্দেহ হচ্ছে। সেদিন সকালবেলা অমৃত নাহুর-বৌকে অপমান করেছিল। নাহু একরোখা গোঁয়ার মানুষ, লাঠি নিয়ে অমৃতকে মারতে ছুটেছিল। সন্ধ্যেবেলা মাঠের আড্ডাতেও সে ছিল না। তাকে একবার থানায় আনিয়ে ভালো করে নেড়েচেড়ে দেখতে হবে।—কিন্তু এসব বাজে কথা এখন থাক। একটা জরুরী খবর আপনাকে দিতে এলাম।' সহসা গলা খাটো করিয়া বলিলেন, —'যমুনাদাস গঙ্গারামের নাম জানেন তো, এখানকার মস্তবড় আড়তদার। সে একটা বেনামী চিঠি পেয়েছে।'

ব্যোমকেশ গাঢ় ঔৎসুক্য দেখাইয়া বলিল,—'বেনামী চিঠি! কী আছে তাতে?'

সুখময়বাবু বলিলেন,—'যমুনাদাস চুপিচুপি আমাকে চিঠি দেখিয়ে গেছে। খামের চিঠি, তাতে স্রেফ লেখা আছেঃ আমি সব জানতে পেরেছি, শিগ্‌গিরই দেখা হবে।'

'তাই নাকি! তাহলে তো যমুনাদাসের ওপর নজর রাখতে হয়।'

'সে-কথা আর বলতে! আমি একজন লোক লাগিয়ে দিয়েছি যমুনাদাসের পেছনে। সে অষ্টপ্রহর যমুনাদাসের ওপর নজর রেখেছে।'

'ভালো, ভালো! আপনি পাকা লোক, ঠিক কাজই করেছেন। এবার হয়তো একটা সুরাহা হবে।'

সুখময়বাবুর মুখে একটু বিনীত আত্মপ্রসন্নতা খেলিয়া গেল,— 'হে-হে—এই কাজ করে চুল পেকে গেল, ব্যোমকেশবাবু। তা সে যাক। এখন আপনার কি খবর বলুন। কিছু পেলেন?'

'ব্যোমকেশ হতাশ স্বরে বলিল,—'কৈ আর পেলাম! যতদূর চাই, নাই নাই সে-পথিক নাই।'

সুখময়বাবু উদ্ধৃতিটা ধরিতে পারিলেন না, কিন্তু যেন বুঝিয়াছেন এমনিভাবে হে-হে করিলেন। তিনি চেয়ারে একেবারে জাম হইয়া বসিয়াছিলেন, এখন টানা-হেঁচড়া করিয়া নিজেকে চেয়ারের বাহুমুক্ত করিলেন। বলিলেন,—'আজ উঠি, থানায় অনেক কাজ পড়ে আছে।'

ব্যোমকেশও উঠিয়া দাঁড়াইল বলিল,—'ভালো কথা, অমৃতর পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পেয়েছেন নাকি?'

সুখময়বাবু একটু ভ্রূ তুলিয়া বলিলেন,—'এখনও পাইনি। কাল-পরশু পাব বোধহয়। কেন বলুন দেখি?'

'পেলে একবার আমাকে দেখাবেন।'

সুখময়বাবু একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন,—'দেখতে চান, দেখাব। কিন্তু ব্যোমকেশবাবু, আপনি রুই-কাতলা ধরতে এসেছেন, আপনি যদি চুনোপুঁটির দিকে নজর দেন তাহলে আমরা বাঁচি কি করে?'

'না না, নজর দিইনি। নিতান্তই অহেতুক কৌতূহল। কথায় বলে—নেই কাজ তো খই ভাজ।'

সুখময়বাবুর মুখে আবার হাসি ফুটিল, তিনি দ্বারের দিকে যাইতে যাইতে প্রথম আমাকে লক্ষ্য করিলেন; বলিলেন,—'এই-যে অজিত-বাবু, কেমন আছেন? গল্প-টল্প লেখা হচ্ছে? আপনার আজগুবি গল্পগুলো পড়তে মন্দ লাগে না—হে হে। তবে রবার্ট ব্লেকের মতো নয়। আচ্ছা, আসি।'

তিনি শ্রুতিবহির্ভূত হইয়া গেলে ব্যোমকেশ আমার দিকে ফিরিয়া চোখ টিপিল; বলিল,—'হে-হে।'

তিন

বৈকালবেলা ছেলেরা আসিয়া আমাদের গ্রামে লইয়া গেল। রেল-লাইনের ধার দিয়া যখন গ্রামের নিকট উপস্থিত হইলাম তখন গ্রামের সমস্ত পুরুষ অধিবাসী আমাদের অভ্যর্থনা করিবার জন্য লাইনের ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, ছেলে-বুড়া কেহ বাদ যায় নাই। সকলের চোখে বিস্ফারিত কৌতূহল। ব্যোমকেশ বক্সী কীদৃশ জীব তাহারা স্বচক্ষে দেখিতে চায়।

মিছিল করিয়া আমরা গ্রামে প্রবেশ করিলাম। পটল অগ্রবর্তী হইয়া আমাদের একটি বাড়িতে লইয়া গেল। কাঁচা-পাকা বাড়ি, সামনের দিকে দুটি পাকা-ঘর, পিছনে খড়ের চাল। মৃত অমৃতের মামার বাড়ি।

অমৃতের মামা বলরামবাবু বাড়ির সামনের চাতালে টেবিল-চেয়ার পাতিয়া চায়ের আয়োজন করিয়াছিলেন, জোড়হস্তে আমাদের সংবর্ধনা করিলেন। লোকটিকে ভালোমানুষ বলিয়া মনে হয়, কথাবলার ভঙ্গীতে সঙ্কুচিত জড়তা। তিনি ভাগিনার মৃত্যুতে খুব বেশী শোকাভিভূত না হইলেও একটু যেন দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছেন।

চায়ের সরঞ্জাম দেখিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—'এসব আবার কেন?'

বলরামবাবু অপ্রতিভভাবে জড়াইয়া জড়াইয়া বলিলেন,—'একটু চা—সামান্য—'

পটল বলিল,—'ব্যোমকেশবাবু, আপনি আমাদের গ্রামে পায়ের ধুলো দিয়েছেন আমাদের ভাগ্যি। চা খেতেই হবে।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আচ্ছা সে পরে হবে, আগে জঙ্গলটা দেখে আসি।'

'চলুন।'

পটল আবার আমাদের লইয়া চলিল। আরও কয়েকজন ছোকরা সঙ্গে চলিল। বলরামবাবুর বাড়ির সম্মুখ দিয়া যে কাঁচা-রাস্তাটা গিয়াছে তাহাই গ্রামের প্রধান রাস্তা। এই রাস্তা একটি অসমতল শিলাকঙ্করপূর্ণ আগাছাভরা মাঠের কিনারায় আসিয়া শেষ হইয়াছে। মাঠের পরপারে একটিমাত্র পাকা বাড়ি ; সদানন্দ সুরের বাড়ি। তাহার পিছনে জঙ্গলের গাছপালা। আমরা মাঠে অবতরণ করিলাম। ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—'এই মাঠে বসে তোমরা সেদিন গল্প করছিলে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ঠিক কোন্ জায়গায় বসেছিলে ?'

'এই যে—' আরও কিছুদূর গিয়া পটল আঙুল দেখাইয়া বলিল,—'এইখানে।'

স্থানটি অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্ন, আগাছা নাই। ব্যোমকেশ বলিল,—'এখান থেকে অমৃত যে-পথে জঙ্গলের দিকে গিয়েছিল সেই পথে নিয়ে চল।'

'আসুন।'

সদানন্দ সুরের দরজায় তালা ঝুলিতেছে, জানালাগুলি বন্ধ। আমরা বাড়ির পাশ দিয়া পিছন দিকে চলিলাম। পিছনে পাঁচিল-ঘেরা উঠান, পাঁচিল প্রায় এক-মানুষ উঁচু, তাহার গায়ে একটি খিড়কি-দরজা। জঙ্গলের গাছপালা খিড়কি-দরজা পর্যন্ত ভিড় করিয়া আসিয়াছে।

বাড়ি অতিক্রম করিয়া আমরা জঙ্গলে প্রবেশ করিলাম। জঙ্গলে পাতা-ঝরা আরম্ভ হইয়াছে, গাছগুলি পত্রবিরল, মাটিতে স্বয়ংবিশীর্ণ পীতপত্রের আস্তরণ। বাড়ির খিড়কি হইতে পঁচিশ-ত্রিশ গজ দূরে একটা প্রকাণ্ড শিমুলগাছ ; স্তম্ভের মতো স্থূল গুঁড়ি দশ-বারো হাত উঁচুতে উঠিয়া শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। পটল আমাদের

শিমুলতলায় লইয়া গিয়া একটা স্থান নির্দেশ করিয়া বলিল,—'এইখানে অমৃত মরে পড়ে ছিল।'

স্থানটি ঝরা-পাতা ও শিমুল-ফুলে আকীর্ণ, অপঘাত মৃত্যুর কোনও চিহ্ন নাই। তবু ব্যোমকেশ স্থানটি ভালো করিয়া খুঁজিয়া দেখিল। কঠিন মাটির উপর কোনও দাগ নাই, কেবল একটা শুক্‌না পাতার নিচে একখণ্ড খড়ি পাওয়া গেল। ব্যোমকেশ খড়িটি তুলিয়া ধরিয়া বলিল,—'এই খড়ি দিয়ে অমৃত গাছের গায়ে ঢেরা কাটতে এসেছিল। কিন্তু গাছের গায়ে খড়ির দাগ নেই। সুতরাং—'

পটল বলিল,—'আজ্ঞে হ্যাঁ, দাগ কাটবার আগেই—'

এখানে দ্রষ্টব্য আর কিছু ছিল না। আমরা ফিরিয়া চলিলাম। ফিরিবার পথে ব্যোমকেশ বলিল,—'সদানন্দ সুরের খিড়কির দরজা বন্ধ আছে কিনা একবার দেখে যাই।'

খিড়কির দরজা ঠেলিয়া দেখা গেল ভিতর হইতে হুড়কা লাগানো। প্রাচীন দরজার তক্তায় ছিদ্র আছে, তাহাতে চোখ লাগাইয়া দেখিলাম, উঠানের মাঝখানে একটি তুলসী-মঞ্চ, বাকী উঠান আগাছায় ভরা। একটা পেয়ারাগাছ এককোণে পাঁচিলের পাশে দাঁড়াইয়া আছে, আর কিছু চোখে পড়িল না।

অতঃপর ব্যোমকেশ পাঁচিলের ধার দিয়া ফিরিয়া চলিল। তাহার দৃষ্টি মাটির দিকে। পাঁচিলের কোণ পর্যন্ত আসিয়া সে হঠাৎ আঙুল দেখাইয়া বলিল,—'ও কি?'

অনাবৃত শুষ্ক মাটির উপর একটি পরিষ্কার অর্ধচন্দ্রাকৃতি চিহ্ন; তাহার আশেপাশে আরও কয়েকটা অস্পষ্ট আঁকাবাঁকা চিহ্ন রহিয়াছে। ব্যোমকেশ ঝুঁকিয়া চিহ্নটা পরীক্ষা করিল, আমরাও দেখিলাম। তারপর সে ঘাড় তুলিয়া দেখিল পাঁচিলের পরপারে পেয়ারাগাছের ডালপালা দেখা যাইতেছে।

বলিলাম,—'কি দেখছ? কিসের চিহ্ন ওগুলো?'

ব্যোমকেশ পটলের দিকে চাহিয়া বলিল,—'কি মনে হয়?'

পটলের মুখ শুকাইয়া গিয়াছে ; সে ওষ্ঠ লেহন করিয়া বলিল,—'ঘোড়ার ক্ষুরের দাগ মনে হচ্ছে।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'হুঁ, ঘোড়া-ভূতের ক্ষুরের দাগ। অমৃত তাহলে মিছেকথা বলেনি।'

ফিরিয়া চলিলাম। ব্যোমকেশের ভ্রূ সংশয়ভরে কুঞ্চিত হইয়া রহিল। তাহার মনে ধোঁকা লাগিয়াছে, ঘোড়ার ক্ষুরের তাৎপর্য সে পরিষ্কার বুঝিতে পারে নাই। চলিতে চলিতে মাত্র দু'একটা কথা হইল। ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল,—'সদানন্দ সুর কতদিন হ'ল বাইরে গেছেন?'

পটল বলিল,—'সাত-আট দিন হ'ল।'

'কবে ফিরবেন বলে যাননি?'

'না।'

'কোথায় গেছেন তাও কেউ জানে না?'

'না।'

বলরামবাবুর বাড়িতে পৌঁছিয়া চেয়ারে বসিলাম। দর্শকের ভিড় কমিয়া গিয়াছে, তবু দু'চারজন অতি-উৎসাহী ব্যক্তি ব্যোমকেশকে দেখিবার আশায় আনাচে কানাচে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বলরামবাবু আমাদের চা ও জলখাবার আনিয়া দিলেন। পটল দাশু গোপাল প্রভৃতি কয়েকজন ছোকরা কাছে দাঁড়াইয়া আমাদের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিল।

চা পান করিতে করিতে ব্যোমকেশ বলরামবাবুকে সওয়াল আরম্ভ করিল—

'অমৃত আপনার আপন ভাগ্নে ছিল?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ওর মা-বাপ কেউ ছিল না?'

'না। আমার বোন অমর্তকে কোলে নিয়ে বিধবা হয়েছিল। আমার কাছে থাকত। তারপর সেও মারা গেল। অমর্তর বয়স তখন পাঁচ বছর।'

'আপনার নিজের ছেলেপুলে নেই?'

'একটি মেয়ে আছে। তার বিয়ে হয়ে গেছে।'

'অমৃতের কত বয়স হয়েছিল?'

'একুশ।'

'তার বিয়ে দেননি?'

'না। বুদ্ধিসুদ্ধি তেমন ছিল না, হ্যালাক্ষ্যাপা গোছের ছিল, তাই বিয়ে দিইনি।'

'কাজকর্ম কিছু করত?'

'মাঝে মাঝে করত, কিন্তু বেশীদিন চাকরি রাখতে পারত না। সান্তালগোলার বড় আড়তদার ভগবতীবাবুর গদিতে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম, কিছুদিন কাজ করেছিল। তারপর বদ্রিদাস মাড়োয়ারীর চালের কলে মাসখানেক ছিল, তা বদ্রিদাসও রাখল না। কিছুদিন থেকে বিশু মল্লিকের চালের কলে ঘোরাঘুরি করছিল, কিন্তু কাজ পায়নি।'

ব্যোমকেশ কিয়ৎকাল নীরবে নারিকেল-লাড়ু চিবাইল, তারপর এক ঢোক চা খাইয়া হঠাৎ প্রশ্ন করিল,—'গ্রামে কারুর ঘোড়া আছে?'

বলরামবাবু চক্ষু বিস্ফারিত করিলেন, ছোকরারাও মুখ তাকাতাকি করিতে লাগিল। শেষে বলরামবাবু বলিলেন,—'গাঁয়ে তো কারুর ঘোড়া নেই!'

'কারুর বন্দুকের লাইসেন্স আছে?'

'আজ্ঞে না।'

'নাড়ু নামে এক ছোকরার কথা শুনেছি, তার ভালো নাম জানি না। তাকে পেলে দু' একটা প্রশ্ন করতাম।'

বলরামবাবু ছোকরাদের পানে তাকাইলেন, তাহারা আর একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল; তারপর পটল বলিল,—'নাড়ু কাল বৌকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে।'

'শ্বশুরবাড়ি কোথায়?'

'কৈলেসপুরে। ট্রেনে যেতে হয়, সান্তালগোলা থেকে তিন-চার স্টেশন দূরে।'

ব্যোমকেশ ভাবিতে ভাবিতে চায়ের পেয়ালা শেষ করিল। নাড়ু হয়তো নিরপরাধ, কিন্তু সে পালাইবে কেন? ভয় পাইয়াছে? আশ্চর্য নয়; এরূপ একটা খুনের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িলে কে না শঙ্কিত হয়?

এইসময়ে একটি ছোকরা বলিয়া উঠিল, 'ওই সদানন্দদা আসছে!'

সকলে একসঙ্গে ঘাড় ফিরাইলাম। রাস্তা দিয়া একটি ভদ্রলোক আসিতেছেন। চেহারা গ্রাম্য হইলেও সাজ-পোশাক গ্রাম্য নয়; গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবি এবং গরদের চাদর, পায়ে কালো বার্নিশ অ্যালবার্ট, হাতে একটি ক্যাম্বিসের ব্যাগ।

একটি ছোকরা চুপিচুপি অন্য এক ছোকরাকে বলিল,—'সদানন্দদার জামা-কাপড়ের বাহার দেখেছিস! নিশ্চয় কলকাতায় গেছল।'

সদানন্দবাবু সামনা-সামনি আসিলে পটল হাঁক দিয়া বলিল,—'সদানন্দদা, গাঁয়ের খবর শুনেছেন?'

সদানন্দবাবু দাঁড়াইলেন, আমাকে এবং ব্যোমকেশকে লক্ষ্য করিলেন, তারপর বলিলেন,—'কী খবর?'

পটল বলিল,—'অম্‌রা মারা গেছে।'

সদানন্দবাবুর চোখে অকপট বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল,—'মারা গেছে! কী হয়েছিল?'

পটল বলিল,—'হয়নি কিছু। বন্দুকের গুলীতে মারা গেছে। কে মেরেছে কেউ জানে না।'

সদানন্দবাবুর মুখখনা ধীরে ধীরে পাথরের মতো নিশ্চল হইয়া গেল, তিনি নিস্পলক নেত্রে চাহিয়া রাহিলেন। পটল বলিল,—'আপনি এই এলেন, এখন বাড়ি যান। পরে সব শুনবেন।'

সদানন্দবাবু ক্ষণেক দ্বিধা করিলেন, তারপর ধীরে ধীরে নিজের বাড়ির দিকে প্রস্থান করিলেন।

তিনি দৃষ্টিবহির্ভূত হইয়া যাইবার পর ব্যোমকেশ পটলকে জিজ্ঞাসা করিল,—'সদানন্দবাবু যখন গ্রাম থেকে গিয়েছিলেন তখন তাঁর হাতে ক্যাম্বিসের ব্যাগ আর স্টীলের ট্রাঙ্ক ছিল না?'

পটল বলিল,—'ঠিক তো, হীরু মোড়ল তাই বলেছিল বটে। সদানন্দদা তোরঙ্গ কোথায় রেখে এলেন!'

এ প্রশ্নের সদুত্তর কাহারও জানা ছিল না। ব্যোমকেশ এদিক ওদিক চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল,—'সন্ধ্যে হয়ে এল, আজ উঠি। সদানন্দবাবুর সঙ্গে দু'একটা কথা বলতে পারলে ভালো হ'ত। কিন্তু তিনি এইমাত্র ফিরেছেন—'

ব্যোমকেশের কথা শেষ হইতে পাইল না, বিরাট বিস্ফোরণের শব্দে আমরা ক্ষণকালের জন্য হতচকিত হইয়া গেলাম। তারপর ব্যোমকেশ একলাফে রাস্তায় নামিয়া সদানন্দ সুরের বাড়ির দিকে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। আমরা তাহার পিছনে ছুটিলাম। শব্দটা ওই দিক হইতেই আসিয়াছে।

সদানন্দ সুরের বাড়ির সম্মুখে পৌঁছিয়া দেখিলাম, বাড়ির সদর দরজার কবাট সামনের চাতালের উপর ভাঙিয়া পড়িয়াছে, সদানন্দ সুর রক্তাক্ত দেহে তাহার মধ্যে পড়িয়া আছেন। খানিকটা কটুগন্ধ ধূম সন্ধ্যার বাতাস লাগিয়া ইতস্তত ছড়াইয়া পড়িতেছে।

চার

ব্যোমকেশ ও আমি চাতালের উপর উঠিলাম, আর যাহারা আমাদের পিছনে আসিয়াছিল তাহারা চাতালের কিনারায় দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে চক্ষু গোল করিয়া দেখিতে লাগিল।

সদানন্দ সুর যে বাঁচিয়া নাই তাহা একবার দেখিয়াই বোঝা যায়। তাহার শরীর অপেক্ষাকৃত অক্ষত বটে; ডান হাতে তালা ও বাঁ হাতে

চাবি দৃঢ়ভাবে ধরা রহিয়াছে ; কিন্তু মাথাটা প্রায় ধড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া উল্টা দিকে ঘুরিয়া গিয়াছে, রক্ত ও মগজ মাখামাখি হইয়া চূর্ণ খুলি হইতে গড়াইয়া পড়িতেছে ; মুখের একপাশটা নাই। বীভৎস দৃশ্য। তিন মিনিট আগে যে-লোকটাকে জলজ্যান্ত দেখিয়াছি, তাহাকে এই অবস্থায় দেখিলে স্নায়বিক ত্রাসে শরীর কাঁপিয়া ওঠে, হাত-পা ঠাণ্ডা হইয়া যায়।

* গ্রামবাসীদের এতক্ষণ বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছিল, পটল প্রথম কণ্ঠস্বর ফিরিয়া পাইল ; কম্পিতস্বরে বলিল,—'ব্যোমকেশবাবু, এসব কী হচ্ছে আমাদের গ্রামে !'

ব্যোমকেশ ভাঙা দরজার নিকট হইতে ঢালাই লোহার একটা টুকরা কুড়াইয়া লইয়া পরীক্ষা করিতেছিল, পটলের কথা বোধহয় শুনিতে পাইল না। লোহার টুকরা ফেলিয়া দিয়া বলিল,—'হ্যাণ্ড-গ্রিনেড ! ক্যাম্বিসের ব্যাগটা কোথায় গেল ?'

ব্যাগটা ছিন্নভিন্ন অবস্থায় একপাশে ছিটকাইয়া পড়িয়া ছিল। ব্যোমকেশ গিয়া সেটার অভ্যন্তরভাগ পরীক্ষা করিল। নূতন ও পুরাতন কয়েকটা জামা-কাপড় রহিয়াছে। একটা নূতন টাইম-পীস ঘড়ি বিস্ফোরণের ধাক্কায় চ্যাপ্টা হইয়া গিয়াছে, একটা কেশতৈলের বোতল ভাঙিয়া কাপড়-চোপড় ভিজিয়া গিয়াছে। আর কিছু নাই।

ব্যোমকেশ বলিল,—'অজিত, তুমি বাইরে থাকো, আমি চট্ করে বাড়ির ভিতরটা দেখে আসি।'

শুধু যে দরজার কবাট ভাঙিয়া পড়িয়াছিল তাহাই নয়, দরজার উপরের খিলান খানিকটা উড়িয়া গিয়াছিল, কয়েকটা ইট বিপজ্জনক-ভাবে ঝুলিয়া ছিল। ব্যোমকেশ যখন লঘুপদে এই রন্ধ্র পার হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল তখন আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। এই অভিশপ্ত বাড়ির মধ্যে কোথায় কোন্ ভয়াবহ মৃত্যু ওৎ পাতিয়া আছে কে জানে ! ব্যোমকেশের যদি কিছু ঘটে, সত্যবতীর সামনে গিয়া দাঁড়াইব কোন্ মুখে ?

'দাঁড়াও, আমিও আসছি'—বলিয়া আমি প্রাণ হাতে করিয়া বাড়িতে ঢুকিয়া পড়িলাম।

ব্যোমকেশ ঘাড় ফিরাইয়া একটু হাসিল ; বলিল,—'ভয়ের কিছু নেই। বিপদ যা ছিল তা সদানন্দ সুরের ওপর দিয়েই কেটে গিয়েছে।'

এদিকে সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে, বাড়ির ভিতরে আলো অতি অল্প। বলিলাম,—'কি দেখবে চটপট দেখে নাও। দিনের আলো ফুরিয়ে আসছে।'

বাড়ির সামনের দিকে দুটি ঘর, পিছনে রান্নাঘর। কোনও ঘরেই লোভনীয় কিছু নাই। যে ঘরের দরজা ভাঙিয়াছিল সে-ঘরে কেবল একটি কোমর-ভাঙা তক্তপোশ আছে ; পাশের ঘরে আর একটি তক্তপোশের উপর বালিস-বিছানা দেখিয়া বোঝা যায় ইহা গৃহস্বামীর শয়নকক্ষ। একটা খোলা দেয়াল-আলমারিতে কয়েকটা ময়লা জামা-কাপড় ছাড়া আর কিছুই নাই।

রান্নাঘরও তথৈবচ। খানকয়েক থালা-বাটি, ঘটি-কলসী, হাঁড়ি-কুড়ি। উনুনটা অপরিষ্কার, তাহার গর্ভে ছাই জমিয়া আছে। সব দেখিয়া শুনিয়া বলিলাম,—'সদানন্দ সুরের অবস্থা ভালো ছিল না মনে হয়।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'হুঁ। ওই দরজাটা দেখেছ?' বলিয়া দ্বারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল।

কাছে গিয়া দেখিলাম। রান্নাঘরের এই দরজা দিয়া উঠানে যাইবার পথ। দরজা ভেজানো রহিয়াছে, টান দিতেই খুলিয়া গেল। বলিলাম—'একি! দরজা খোলা ছিল!'

ব্যোমকেশ বলিল,—'সদানন্দ সুর খুলে রেখে যাননি। হুড়কো লাগিয়ে গিয়েছিলেন। ভালো করে দ্যাখো।'

ভালো করিয়া দেখিলাম, দ্বারের পাশে হুড়কা ঝুলিতেছে, কিন্তু তাহার দৈর্ঘ্য বড়জোর হাতখানেক। বলিলাম,—'একি, এতটুকু হুড়কো!'

ব্যোমকেশ বলিল,—'বুঝতে পারলে না? হুড়কোটা প্রমাণ মাপেরই ছিল এবং লাগানো ছিল। তারপর কেউ বাইরে থেকে দরজার ফাঁক দিয়ে করাত ঢুকিয়ে ওটাকে কেটেছে, তারপর ঘরে ঢুকেছে। ওই ছাখো হুড়কোর বাকী অংশটা।' ব্যোমকেশ দেখাইল, উনানের পাশে জ্বালানী কাঠের সঙ্গে হুড়কোর বাকী অংশটা পড়িয়া আছে।

ব্যাপার কতক কতক আন্দাজ করিতে পারিলেও সমগ্র পরিস্থিতি ধোঁয়াটে হইয়া রহিল। সদানন্দ সুরের কোনও শত্রু তাঁহার অনুপস্থিতিকালে হুড়কা কাটিয়া বাড়িতে প্রবেশ করিয়াছিল। তারপর? আজ বোমা ফাটিল কি করিয়া? কে বোমা ফাটাইল?

খোলা দরজা দিয়া আমরা উঠানে নামিলাম। পাঁচিলঘেরা উঠানের এককোণে কুয়া, অন্য কোণে পেয়ারাগাছ। ব্যোমকেশ সিধা পেয়ারাগাছের কাছে গিয়া মাটি দেখিল। মাটিতে যে অস্পষ্ট দাগ রহিয়াছে তাহা হইতে আমি কিছু অনুমান করিতে পারিলাম না, কিন্তু ব্যোমকেশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—'হুঁ, যা সন্দেহ করেছিলাম তাই। যিনি এসেছিলেন তিনি এইখানেই পাঁচিল টপ্‌কেছিলেন।'

বলিলাম,—'তাই নাকি! কিন্তু পাঁচিল টপ্‌কাবার কী দরকার ছিল? করাত দিয়ে খিড়কি-দোরের হুড়কো কাটল না কেন?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'খিড়কির হুড়কো করাত দিয়ে কাটলে খিড়কি-দরজা খোলা থাকত, কারুর চোখে পড়তে পারত। তাতে আগন্তুক মহাশয়ের অসুবিধা ছিল। আমি গোড়াতেই ভুল বুঝেছিলাম, নৈলে সদানন্দ সুর মরতেন না।'

'কী ভুল বুঝেছিলে?'

'আমি সন্দেহ করেছিলাম, যাঁকে ধরতে এখানে এসেছি তিনি সদানন্দ সুর। কিন্তু তা নয়।—চল, এখন যাওয়া যাক। বাঘমারি গ্রামে আর কিছু দেখবার নেই।'

রান্নাঘরের ভিতর দিয়া আবার সদরে ফিরিয়া আসিলাম। ইতিমধ্যে গ্রামের সমস্ত লোক আসিয়া জড়ো হইয়াছে এবং চাতালের নিচে ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে মৃতদেহের পানে চাহিয়া আছে। মৃত্যু সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহলের অন্ত নাই।

ভিড়ের মধ্য হইতে পটল বলিয়া উঠিল,—'ব্যোমকেশবাবু, বাড়ির মধ্যে কী দেখলেন? কাউকে পেলেন?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'না। পুলিসে খবর পাঠিয়েছ?'

পটল বলিল,—'না। আপনি আছেন তাই—'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আমি কেউ নয়, পুলিসকে খবর দিতে হবে। আচ্ছা, তোমাদের যেতে হবে না; আমরা তো যাচ্ছি, সুখময়বাবুকে খবর দিয়ে যাব।'

'আপনারা যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ। যতক্ষণ পুলিস না আসে ততক্ষণ তোমরা কয়েকজন এখানে থেকো।'

'পুলিস কি আজ রাত্রে আসবে?'

'আসবে।'

আমরা আবার রেল-লাইনের ধার দিয়া চলিয়াছি। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া চাঁদের আলো ফুটি-ফুটি করিতেছে। একটা মালগাড়ী দীর্ঘ দেহভার টানিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে চলিয়া গেল।

আমি বলিলাম,—'ব্যোমকেশ, তুমি এ-ব্যাপারের কিছু কিছু বুঝেছ মনে হচ্চে। আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারিনি।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ উত্তর দিল না, তারপর বলিল,—'অমৃতের মৃত্যুর সঙ্গে সদানন্দ সুরের মৃত্যুর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে এটা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ?'

'সম্বন্ধ আছে নাকি? কী সম্বন্ধ?'

ব্যোমকেশ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—'অমৃত বেচারা

বেঘোরে মারা গেল। সে-রাত্রে যদি সে জঙ্গলে না যেত তাহলে মরত না। যে তাকে মেরেছে সে তাকে মারতে আসেনি।'

'তবে কাকে মারতে এসেছিল ?'

'সদানন্দ সুরকে।'

'কিন্তু—সদানন্দ সুর তো তখন বাড়ী ছিলেন না !'

'ছিলেন না বলেই আততায়ী এসেছিল তাঁকে মারতে।'

'বড্ড বেশী রহস্যময় শোনাচ্ছে। অনেকটা কালিদাসের হেঁয়ালির মতো—নেই তাই খাচ্চ তুমি থাকলে কোথায় পেতে !—কিন্তু যাক, আজ বোমা ফাটল কি করে ?'

ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইল, ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল,—'বুবি-ট্র্যাপ্ কাকে বলে জানো ?'

বলিলাম,—'কথাটা শুনেছি। ফাঁদ পাতা ?'

'হ্যাঁ। সদানন্দ সুরকে একজন মারতে চেয়েছিল। সে যখন জানতে পারল সদানন্দ সুর বাইরে গেছেন, তখন একদিন সন্ধ্যের পর এসে পাঁচিল ডিঙিয়ে উঠোনে ঢুকল, দরজার হুড়কো করাত দিয়ে কেটে বাড়িতে ঢুকল, তারপর বন্ধ সদর-দরজার মাথায় এমনভাবে একটা বোমা সাজিয়ে রেখে গেল যে, দরজা খুললেই বোমা ফাটবে। আজ সদানন্দ সুর ফিরে এসে দরজা খুললেন, অমনি বোমা ফাটল। এবার বুঝতে পেরেছ ?'

'বুঝেছি। কিন্তু লোকটা কে ?'

'এখনও নাম জানি না। কিন্তু তিনি অস্ত্রশস্ত্রের চোরা কারবার করেন এবং কালো ঘোড়ার পিঠে চড়ে রাত্রিবেলা যুদ্ধযাত্রা করেন। লোকটির নামধাম জানার জন্যে আমার মনটাও বড় ব্যগ্র হয়েছে।'

সান্তালগোলায় পৌঁছিয়া দেখিলাম দিনের কর্ম-কোলাহল শান্ত হইয়াছে, বেশীর ভাগ দোকানপাট বন্ধ। থানা খোলা আছে,

সুখময়বাবু টেবিলে বসিয়া কাগজপত্র দেখিতেছেন। আমাদের পদশব্দে তিনি চোখ তুলিলেন,—'কী খবর ?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'খবর গুরুতর। বাঘমারিতে আর একটা খুন হয়েছে।'

'খুন !' সুখময়বাবু চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

'হ্যাঁ। সদানন্দ সুরকে আপনি চেনেন ?'

সুখময়বাবু ভ্রূকুটি করিয়া মাথা নাড়িলেন,—'হয়তো দেখেছি, মনে পড়ছে না। সদানন্দ সুর খুন হয়েছে ? কিন্তু আপনি সকলের আগে এ-খবর পেলেন কোথা থেকে ?'

'আমি বাঘমারিতে ছিলাম।'

সুখময়বাবুর মুখ হইতে ক্ষণেকের জন্য মিষ্টতার মুখোশ খসিয়া পড়িল, তিনি রূঢ়চক্ষে চাহিয়া বলিলেন,—'আপনি বাঘমারিতে গিয়েছিলেন ! আমি মানা করা সত্ত্বেও গিয়েছিলেন !'

ব্যোমকেশের দৃষ্টিও প্রখর হইয়া উঠিল,—'আপনি আমাকে মানা করবার কে ?'

সুখময়বাবু কড়া সুরে বলিলেন,—'আমি এ এলাকার বড় দারোগা, পুলিসের কর্তা।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আপনি পুলিসের হর্তাকর্তা বিধাতা হ'তে পারেন, কিন্তু আমাকে হুকুম দেবার মালিক আপনি নন। ইন্সপেক্টর সামন্ত, আমি সরকারের কাজে এখানে এসেছি। আপনার ওপর হুকুম আছে সবরকমে আমাকে সাহায্য করবেন। কিন্তু সাহায্য করা দূরের কথা, আপনি পদে পদে বাগড়া দেবার চেষ্টা করছেন। আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, ফের যদি আপনার এতটুকু বেচাল দেখি, আপনাকে এ-এলাকা ছাড়তে হবে। এমন কি চাকরি ছাড়াও বিচিত্র নয়।'

সুখময়বাবু বোধকরি ব্যোমকেশকে গোবেচারি মনে করিয়া এতটা দাপট দেখাইয়াছিলেন, এখন তাহাকে নিজমূর্তি ধারণ করিতে দেখিয়া একেবারে কেঁচো হইয়া গেলেন। তাঁহার মিষ্টতার মুখোশ পলকের

মধ্যে আবার মুখে ফিরিয়া আসিল। তিনি কণ্ঠস্বরে বশংবদ দীনতা ঢালিয়া দিয়া বলিলেন,—'আমি কি-যে বলছি তার ঠিক নেই! আমাকে মাপ করুন ব্যোমকেশবাবু। আজ বিকেল থেকে পেটে একটা ব্যথা ধরেছে, তাই মাথার ঠিক নেই। আপনাকে হুকুম করব আমি! ছি-ছি, কী বলেন আপনি! আমিই আপনার হুকুমের গোলাম। হে-হে।—তা সদানন্দ সুর খুন হয়েছে?'

ব্যোমকেশের তখনও মেজাজ ঠাণ্ডা হয় নাই; সে বলিল,—'অমৃতের মৃত্যুর খবর পেয়ে আপনি সে-রাত্রে তদন্ত করতে যাননি, পরদিন সকালবেলা গিয়েছিলেন। এ খবরটা আপনার ওপরওয়ালার কানে পৌঁছুলে তিনি কি করবেন তা বোধহয় আপনার জানা আছে?'

সুখময়বাবু কাকুতিপূর্ণ স্বরে বলিলেন,—'কি বলব ব্যোমকেশবাবু, সেদিনও কলিকের ব্যথা ধরেছিল, হে-হে, একেবারে পেড়ে ফেলেছিল। নৈলে খুনের খবর পেয়ে যাব না, এ কি সম্ভব! তা যাক্‌গে ও-কথা। এখন এই সদানন্দ সুর—। আমি এখনি বেরুচ্ছি। এই জমাদার, জল্‌দি ইধার আও! হমারা ঘোড়া'পর জিন চড়ানে বোলো। তুম্‌ভি তৈয়ার হো লেও। ভারী খুন হুয়া হ্যায়। আভি যানা পড়েগা।'

অতঃপর সুখময়বাবু রণসাজে সজ্জিত হইয়া অশ্বারোহণে যাত্রা করিবার উপক্রম করিতেছেন দেখিয়া আমরা চলিয়া আসিলাম। পাড়াগাঁয়ে পুলিসকে তদন্ত উপলক্ষে পথহীন মাঠে-ঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়, তাই বোধকরি তাহাদের ঘোড়ার ব্যবস্থা।

পাঁচ

পরদিন সকালবেলা প্রাতরাশের পর ব্যোমকেশ বলিল,—'চল, স্টেশনে বেড়িয়ে আসা যাক।'

সকাল সাতটায় একটা ট্রেন চলিয়া গিয়াছে, আর একটা ট্রেন

আসিবে ঘণ্টা দুই পরে। স্টেশনে ভিড় নাই, প্রবেশদ্বারে টিকিট-চেকার নাই। স্টেশনমাস্টার হরিবিলাসবাবু ছাড়া আর সকলেই বোধকরি এই অবকাশে নিজ নিজ কোয়ার্টারে চা খাইতে গিয়াছে।

হরিবিলাসবাবুর সহিত আমাদের পরিচয় হইয়াছিল। অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির লোক, অজীর্ণ-জীর্ণ শরীর। ওজন করিয়া কথা বলেন : একটি কথা বলিবার আগে পাঁচবার অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করেন। আমাদের সহিত পরিচয় হইলেও অধিক বাক্য-বিনিময় হয় নাই। আমরা আসিয়া যখন শূন্য প্ল্যাটফর্মের উপর অলসভাবে পায়চারি করিতে লাগিলাম, তখন তিনি অফিস-ঘর হইতে চশমার উপর দিয়া আমাদের লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু উচ্চবাচ্য করিলেন না।

ব্যোমকেশ অবশ্য প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করিবার জন্য আসে নাই, সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আসিয়াছিল ; কিন্তু সে হরিবিলাসবাবুর কাছে গেল না। তাঁহার নিকট হইতে সংবাদ সংগ্রহ করা এবং খনির গর্ভ হইতে মণিমাণিক্য আহরণ সমান শ্রমসাপেক্ষ। তার চেয়ে অন্য কেহ যদি আসিয়া পড়ে—

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না, টিকিট-চেকার মনোতোষ বোধহয় নিজের কোয়ার্টার হইতে আমাদের দেখিতে পাইয়াছিল, মুখ মুছিতে মুছিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভারি তোখড় ছেলে, কথাবার্তায় চটপটে। বলিল,—'কী কাণ্ড দাদা! আপনার চোখের সামনে এই ব্যাপার হ'ল—অ্যাঁ!'

ব্যোমকেশ বলিল,—'খবর পৌঁছে গেছে দেখছি!'

মনোতোষ বলিল,—'খবর পৌঁছবে না! কাল রাত্রে দশটা সতরোর প্যাসেঞ্জার তখনও ইন্ হয় নি, খবর এসে হাজির। তা কী দেখলেন দাদা? দুম্ করে আপনার চোখের সামনে বোমা ফাটল?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'ঠিক চোখের সামনে বোমা ফাটে নি, তবে কানের সামনে বটে। আপনি সদানন্দ সুরকে চিনতেন?'

'চিনতাম না! চারটে তিপান্নর গাড়ী থেকে নামলেন, আমাকে

টিকিট দিয়ে ব্যাগ হাতে করে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, আমি শুধোলাম—, কি দাদা, কলকাতা গেছলেন দেখছি, কেমন বেড়ালেন চেড়ালেন? উনি হেসে বললেন—কলকাতা কি বেড়াবার জায়গা, সেখানে গিয়ে খালি চ্যাড়ালাম। এই ব'লে হাসতে হাসতে চলে গেলেন। তখন কে জানতো আধঘণ্টাও কাটবে না।'

ব্যোমকেশ ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিল,—'আচ্ছা, সদানন্দ সুর যখন বাইরে গিয়েছিলেন তখন আপনি তাঁকে দেখেছিলেন?'

মনোতোষ বলিল,—'দেখিনি? আমার চোখ এড়িয়ে এ-ইস্টিশান থেকে কি কারুর বেরুবার জো আছে দাদা। দিন আষ্টেক-দশ আগেকার কথা; সকালবেলা আমাকে টিকিট দেখিয়ে ইস্টিশানে ঢুকলেন, সাতটা তিনের ডাউন প্যাসেঞ্জারে চলে গেলেন।'

'কলকাতার টিকিট ছিল?'

'অ্যা—তা তো ঠিক মনে পড়ছে না, দাদা। তবে কলকাতা ছাড়া আর কি হতে পারে!'

'কলকাতার দিকে অন্য স্টেশন হতে পারে।—সে যাক। তাঁর সঙ্গে কী কী মাল ছিল বলুন তো।'

'মাল!'—মনোতোষ একটু মাথা চুলকাইয়া বলিল, 'যতদূর মনে পড়ছে, এক হাতে ক্যাম্বিসের ব্যাগ, অন্য হাতে স্টীল-ট্রাঙ্ক ছিল। কেন বলুন তো?'

'স্টীল-ট্রাঙ্কটা সদানন্দবাবু ফিরিয়ে আনেন নি। তার মানে কোথাও রেখে এসেছিলেন। যাক্, আপনি তো দেখছি লোকটিকে ভালোভাবেই চিনতেন। কেমন মানুষ ছিলেন তিনি?'

'ঐটি বলতে পারব না, দাদা। পরচিত্ত অন্ধকার। তবে কথা-বার্তায় ভালো ছিলেন। কারুর সাতে-পাঁচে থাকতেন না, নিজের ধান্দায় ঘুরতেন। মাসখানেক আগে আমাদের মাস্টারমশায়ের কাছে খুব যাতায়াত ছিল।'—বলিয়া স্টেশনমাস্টারের ঘরের দিকে আঙুল দেখাইল।

'তাই নাকি! কিসের জন্যে যাতায়াত?'

'তা জানিনে, দাদা। দুজনে মুখোমুখি বসে কী গুজ-গুজ ফুস্‌ফুস্‌ করতেন ওঁরাই জানেন। আপনি মাস্টারমশাইকে শুধোন না।'

'হুঁ, তাই করি।'

হরিবিলাসবাবুর ঘরের সামনে গিয়া দাঁড়াইলাম। ব্যোমকেশ বলিল,—'মাস্টারমশাই, আসতে পারি?'

হরিবিলাসবাবু এমনভাবে ভ্রূ তুলিয়া চাহিলেন যেন আমাদের চিনিতেই পারেন নাই। তারপর, কাজে বিঘ্ন করার জন্য বিরক্ত হইয়াছেন এমনিভাবে হাতের কলম রাখিয়া বলিলেন,—'আসুন।'

আমরা ঘরে গিয়া বসিলাম। বহু খাতাপত্রে ভারাক্রান্ত প্রকাণ্ড টেবিলের ওপারে তিনি, এপারে আমরা। ব্যোমকেশ বলিল,—'সদানন্দ সুর মারা গেছেন শুনেছেন বোধহয়?'

হরিবিলাসবাবু প্রশ্নটাকে অত্যন্ত সন্দিগ্ধভাবে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন,—'শুনেছি।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'তাঁর সঙ্গে আপনার জানাশোনা ছিল।'

যেন এই কথার উত্তরের উপর জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে এমনিভাবে গভীর বিবেচনার পর হরিবিলাসবাবু বলিলেন,—'সামান্য জানাশোনা ছিল।'

ব্যোমকেশ ঈষৎ অধীর কণ্ঠে বলিল,—'দেখুন, আপনি মনে করবেন না, নাহক কৌতূহলের বশেই আপনাকে প্রশ্ন করছি। অত্যন্ত ভয়াবহভাবে সদানন্দবাবুর মৃত্যু হয়েছে, আমি পুলিসের পক্ষ থেকে তারই তদন্ত করতে এসেছি।—এখন বলুন কোন্ সূত্রে সদানন্দবাবুর সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়েছিল?'

হরিবিলাসবাবুর চোপ্‌সানো মুখ যেন আরও চুপ্‌সিয়া গেল। তিনি দু'চার বার গলা-ঝাড়া দিয়া অত্যন্ত দ্বিধাসঙ্কুল কণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—'সদানন্দ সুরের ভগিনীপতি প্রাণকেষ্ট পাল রেলের লাইন-ইন্সপেক্টর, তাঁর সঙ্গে আমার আগে থাকতে পরিচয় আছে।

মাসকয়েক হ'ল প্রাণকেষ্টবাবু এ-লাইনে এসেছেন ; রামডিহি জংশনে তাঁর হেড-কোয়ার্টার। ট্রলিতে চ'ড়ে রেলের লাইন পরিদর্শন ক'রে বেড়ানো তাঁর কাজ। কাজের উপলক্ষে সান্তালগোলা দিয়ে তিনি প্রায়ই যাতায়াত করেন, আমার সঙ্গে দেখা হয়। একদিন প্রাণকেষ্টবাবু এসেছেন, আমি তাঁর সঙ্গে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে কথা কইছি, এমন সময় সদানন্দবাবু প্ল্যাটফর্মে এলেন। প্রাণকেষ্টবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন ; বললেন—আমার সম্বন্ধী। সেই থেকে আমি সদানন্দবাবুকে চিনি।'

শুনিতে শুনিতে ব্যোমকেশের দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিয়াছিল ; সে বলিল,—'কতদিন আগের কথা ?'

'দু'তিন মাস হবে।'

'প্রাণকেষ্টবাবু প্রায়ই এ-লাইনে যাতায়াত করেন ! শেষ কবে এসেছিলেন ?'

'চার-পাঁচ দিন আগে। স্টেশনে বেশীক্ষণ ছিলেন না, ট্রলিতে চড়ে লাইন দেখতে চলে গেলেন।'

'শালা-ভগিনীপতির মধ্যে বেশ সদ্ভাব ছিল ?'

'ভেতরে কি ছিল জানি না, বাইরে সদ্ভাব ছিল।'

'যাক। তারপর থেকে সদানন্দ সুর আপনার কাছে যাতায়াত করতেন ? কী উপলক্ষে যাতায়াত করতেন ?'

হরিবিলাসবাবু আবার কিছুক্ষণ নীরবে চিত্ত মন্থন করিয়া বলিলেন,—'সদানন্দবাবু দালাল ছিলেন, ছোটখাটো জিনিসের দালালি করতেন। আমার ডিস্‌পেপ্‌সিয়া আছে দেখে তিনি আমাকে কবিরাজী চিকিৎসা করাবার জন্য ভজাচ্ছিলেন। দু'এক শিশি গছিয়েছিলেন ; হর্তুকি আর বিট্‌নুন। তাতে কিছু হ'ল না।'

হরি হরি, শেষে হরীতকী আর বিট্‌নুন ! ব্যোমকেশ তবু প্রশ্ন করিল,—'এ ছাড়া সদানন্দ সুরের সঙ্গে আপনার আর কোনও সম্বন্ধ ছিল না ?'

'না।'

নিশ্বাস ছাড়িয়া ব্যোমকেশ উঠিয়া পড়িল,—'আপনাকে অনর্থক কষ্ট দিলাম। প্রাণকেষ্টবাবু এখন রামডিহি জংশনেই আছেন?'

'হ্যাঁ।'

'নমস্কার।—চল অজিত।'

স্টেশনের বাহিরে আসিয়া বলিলাম,—'এবার কী?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'ওবেলা রামডিহিতে গিয়ে প্রাণকেষ্ট পাল মহাশয়কে দর্শন করে আসতে হবে। তিনি শ্যালকের মৃত্যুসংবাদ যদি বা এখনও না পেয়ে থাকেন, বিকেল নাগাদ নিশ্চয় পাবেন।—হরিবিলাসবাবুকে কেমন মনে হ'ল?'

বলিলাম,—'আকার-সদৃশী প্রজ্ঞা। যেমন ঘুণ-ধরা চেহারা তেমনি মরচে-ধরা বুদ্ধি। শূন্য সিন্দুকে ডবল তালা। তুমি যদি সন্দেহ করে থাকো যে উনি লুকিয়ে লুকিয়ে গোলা-বারুদের কালোবাজার করছেন তাহলে ও-সন্দেহ ত্যাগ করতে পার। হরিবিলাসবাবুর একমাত্র গোলা হচ্ছে হরীতকী-খণ্ড, আর বারুদ—বিট্‌নুন।'

ব্যোমকেশ হাসিল; বলিল,—'চল, বাজারটা ঘুরে আসা যাক।'

'বাজারে কী দরকার?'

'এসই না।'

গঞ্জের কর্মব্যস্ততা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক আড়তের সামনে মুক্তস্থানে বহু গরুর গাড়ীর ঠেলাঠেলি, দুই-চারিটা ঘোড়ায়-টানা খোলা ট্রাক-জাতীয় গাড়ীও আছে। প্রত্যেক গোলা হইতে 'রামে রাম দুয়ে দুই' শব্দ উঠিতেছে। ডাঁই-করা কাঁচা-মাল পাঁচ-সেরী বাটখারায় ওজন হইতেছে।

একটি গোলায় এক বাঙালী যুবক দাঁড়াইয়া কাজকর্ম তদারক করিতেছিলেন, ব্যোমকেশ গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—'এটা নফর কুণ্ডু মশায়ের গোলা না?'

ছোকরা বোধহয় ব্যোমকেশের মুখ চিনিত, সসম্ভ্রমে বলিল,—'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি তাঁর ভাইপো।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'বেশ বেশ। কুণ্ডুমশাই কোথায়?'

ছোকরা বলিল,—'আজ্ঞে, কাকা এখানে নেই, বাইরে গেছেন। কিছু দরকার আছে কি?'

'দরকার এমন কিছু নয়। কোথায় গেছেন?'

'আজ্ঞে, তা কিছু বলে যাননি।'

'তাই নাকি! কবে গেছেন?'

'গত মঙ্গলবার বিকেলবেলা।'

ব্যোমকেশ আড়চোখে আমার পানে চাহিল। আমার মনে পড়িয়া গেল, গত সোমবারে আমি রামডিহি স্টেশনে গিয়া বেনামী চিঠি ডাকে দিয়া আসিয়াছিলাম। স্বাভাবিক নিয়মে চিঠি মঙ্গলবারে এখানে পৌঁছিয়াছে। নফর কুণ্ডুর নামেও একটি বেনামী চিঠি ছিল। তবে কি চিঠি পাইয়া পাখী উড়িয়াছে? নফর কুণ্ডুই আমাদের অচিন পাখী? কিন্তু সে যাই হোক, ভাইপো ছোকরা কিছু জানে বলিয়া মনে হয় না; সরলভাবে সব কথার উত্তর দিতেছে।

ব্যোমকেশ বলিল,—'তিনি কবে ফিরবেন তাও বোধহয় জানা নেই?'

'আজ্ঞে না, কিছু বলে যান নি।'

ব্যোমকেশ একটু চিন্তা করিয়া বলিল,—'আচ্ছা, যেদিন নফরবাবু চলে যান সেদিন সকালে কি কোনও চিঠিপত্র পেয়েছিলেন?'

ছোকরা বলিল,—'চিঠি রোজই দু'চারখানা আসে, সেদিনও এসেছিল।'

'হুঁ।'

প্রস্থানোদ্যত হইয়া ব্যোমকেশ আবার ঘুরিয়া দাঁড়াইল,—'তোমাদের ক'টা ঘোড়া আছে?'

ছোকরা অবাক হইয়া চাহিল,—'ঘোড়া!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঘোড়া। ওই-যে ট্রাক্ টানে।' ব্যোমকেশ আঙুল দিয়া পাশের গোলা দেখাইল।'

যুবক বুঝিয়া বলিল,—'ও—না, আমাদের ঘোড়া-টানা ট্রাক্ নেই, গরুর গাড়িতে চলে যায়।'

এইসময় এক ইউনিফর্ম-পরা কনেস্টবল আসিয়া জোড়পায়ে দাঁড়াইয়া ব্যোমকেশকে স্যালুট করিল,—'হুজুর, দারোগাসাহেব সেলাম দিয়া হ্যায়।'

ব্যোমকেশ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চাহিল; বলিল,—'চল, যাচ্ছি।'

ছয়

কাছেই থানা। সেই দিকে যাইতে যাইতে ব্যোমকেশ বলিল,—'সুখময় দারোগা কি রকম ফিচেল দেখেছ? হাটের মাঝখানে কনেস্টবল পাঠিয়েছে, যাতে কারুর জানতে বাকি না থাকে যে পুলিসের সঙ্গে আমার ভারি দহরম মহরম।'

'হুঁ। কিন্তু তলব কিসের জন্যে?'

'বোধহয় অমৃতর পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এসেছে।'

থানায় পদার্পণ করিতেই সুখময় দারোগা মুখে মধুর রসের ফোয়ারা ছুটাইয়া দিলেন,—'আসুন আসুন ব্যোমকেশবাবু, আসুন অজিতবাবু, বসুন বসুন। ব্যোমকেশবাবু আপনি এই চেয়ারটাতে বসুন। আমি আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম, হঠাৎ নজরে পড়ল আপনারা এদিকে আসছেন। হে-হে, এই নিন অমৃতর পোস্টমর্টেম রিপোর্ট। বুদ্ধি বটে আপনার; ঠিক ধরেছিলেন, বন্দুকের গুলীতেই মরেছে।' বলিয়া ডাক্তারের রিপোর্ট ব্যোমকেশের হাতে দিলেন।

বিচিত্র জীব এই সুখময়বাবু। এইরূপ চরিত্র আমরা সকলেই দেখিয়াছি এবং মনে মনে সহিংস তারিফ করিয়াছি। কিন্তু

ভালবাসিতে পারি নাই। ইঁহারা কেবল পুলিস-বিভাগে নয়, জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই ছড়াইয়া আছেন।

রিপোর্ট পড়িয়া ব্যোমকেশ বলিল,—'গুলীটা শরীরের মধ্যেই পাওয়া গিয়েছে দেখছি। কোথায় সেটা ?'

'এই যে !' একটা নম্বর-আঁটা টিনের কৌটা হইতে মাষকলাইয়ের মতো একটি সীসার টুকরা লইয়া সুখময়বাবু তাহার হাতে দিলেন।

করতলে গুলীটি রাখিয়া ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ সেটিকে সমীক্ষণ করিল, তারপর সুখময়বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল,—'এ থেকে কিছু বুঝলেন ?'

সুখময়বাবু বলিলেন,—'আজ্ঞে, গুলী দেখে বোঝা যাচ্ছে পিস্তল কিম্বা রিভলবারের গুলী। এ ছাড়া বোঝবার আর কিছু আছে কি ?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আছে বৈকি। গুলী থেকে বোঝা যাচ্ছে '৩৮ অটোম্যাটিক থেকে গুলী বেরিয়েছে, যে '৩৮ অটোম্যাটিক যুদ্ধের সময় মার্কিন সৈন্য ব্যবহার করত। অর্থাৎ—' ব্যোমকেশ থামিল।

সুখময়বাবু বলিলেন,—'অর্থাৎ অমৃতকে যে খুন করেছে এবং আপনি যাকে খুঁজতে এসেছেন তাদের মধ্যে যোগাযোগ আছে, এমন কি তারা একই লোক হতে পারে।

'কেমন ?'

ব্যোমকেশ গুলীটি তাঁহাকে ফেরত দিয়া বলিল,— 'এ বিষয়ে আমার কিছু না বলাই ভালো। আপনার কাজ অমৃতের হত্যাকারীকে ধরা, সে-কাজ আপনি করবেন। আমার কাজ অন্য।'

'তা তো বটেই, তা তো বটেই। হ্যাঁ ভালো কথা, সদানন্দ সুরের লাশ হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছি, রিপোর্ট এলেই আপনাকে দেখাব।'

'আমাকে সদানন্দ সুরের রিপোর্ট দেখানোর দরকার নেই। এটাও আপনারই কেস্, আমি হস্তক্ষেপ করতে চাই না। আমি রুই-কাতলা ধরতে এসেছি, চুনোপুঁটিতে আমার দরকার কি বলুন।'

সুখময়বাবুর চক্ষুদুটি ধূর্ত কৌতুকে ভরিয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, —'সে-কথা একশো বার। কিন্তু ব্যোমকেশবাবু, আপনার জালে যখন রুই-কাতলা উঠবে তখন আমার চুনোপুঁটিও সেই জালেই উঠবে; আমাকে আলাদা জাল ফেলতে হবে না। হে হে হে হে।—চললেন নাকি? আচ্ছা, নমস্কার।'

বাহিরে আসিলাম। ব্যোমকেশ আমার পানে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল। লোকটার দুষ্টবুদ্ধির শেষ নাই, অথচ তাহার কার্যকলাপে না হাসিয়াও থাকা যায় না। ব্যোমকেশ বলিল,—'এখনও রোদ চড়েনি, চলো চালের কল দুটো দেখে যাই।'

রাস্তা দিয়া ঘুরিয়া বিশ্বনাথ রাইস্ মিল্-এর সম্মুখে উপস্থিত হইতে পাঁচ মিনিট লাগিল। বেশ বড় চালের কল, পাঁচ-ছয় বিঘা জমির উপর প্রসারিত; কাঁটা-তারের বেড়া দিয়া ঘেরা। গুর্খা-রক্ষিত ফটক দিয়া প্রবেশ করিলে প্রথমেই সামনে প্রকাণ্ড শান-বাঁধানো চাতাল চোখে পড়ে। চাতালের ওপারে একটি পুকুর, বাঁ পাশে ইঞ্জিন-ঘর ও ধান-ভানার করোগেটের ছাউনি; ডান পাশে গুদাম, দপ্তর ও মালিকের থাকিবার জন্য একসারি কক্ষ। সকাল-বেলা কাজ চালু আছে, ধান-ভানার ছাউনি হইতে ছড়্ ছড়্ ছর্‌র্‌র্ শব্দ আসিতেছে। কুলী-মজুরেরা কাজে ব্যস্ত, গরুর গাড়ী ও ঘোড়ার ট্রাক হইতে বস্তা ওঠা-নামা হইতেছে।

চালকলের মালিকের নাম বিশ্বনাথ মল্লিক। থানা হইতে তাঁহার নাম সংগ্রহ করিলেও এবং বেনামী চিঠি পাঠাইলেও চাক্ষুষ পরিচয় এখনও হয় নাই। আমরা গুর্খার মারফত এত্তালা পাঠাইয়া মিল্-এ প্রবেশ করিলাম। দপ্তরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম বিশ্বনাথবাবু সেখানে নাই, একজন মুহুরী গোছের লোক গদিতে বসিয়া খাতাপত্র লিখিতেছে।

'কী চান?'

'বিশ্বনাথবাবু আছেন? আমরা পুলিসের পক্ষ থেকে আসছি।'

লোকটি তটস্থ হইয়া উঠিল,—'আসুন আসুন, বসতে আজ্ঞে হোক। কর্তা মিল্-এর কাজ তদারক করতে গেছেন, এখনি আসবেন। তাঁকে খবর পাঠাব কি?'

ঘরের অর্ধেক মেঝে জুড়িয়া গদির বিছানা, আমরা গদির উপর উপবেশন করিলাম। সত্য কথা বলিতে কি, আধুনিক চেয়ার-সোফার চেয়ে সাবেক গদি-ফরাশ ঢের বেশী আরামের। ব্যোমকেশ একটি সুপুষ্ট তাকিয়া কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল,—'না না, তাঁকে ডেকে পাঠানোর দরকার নেই। সামান্য দু'চারটে কথা জিজ্ঞেস করার আছে, তা সে আপনিই বলতে পারবেন। আপনি বুঝি মিল্-এর হিসেব রাখেন?'

লোকটি সবিনয়ে হস্তঘর্ষণ করিয়া বলিল,—'আজ্ঞে আমি মিল্-এর নায়েব-সরকার। অধীনের নাম নীলকণ্ঠ অধিকারী। আপনি কি ব্যোমকেশ বক্সী মশাই?'

ব্যোমকেশ হাসিয়া ঘাড় নাড়িল। নীলকণ্ঠ অধিকারী ভক্তি-তদ্‌গত চক্ষে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। এমন লোক আছে পুলিসের নাম শুনিলে যাহাদের হৃদয় বিগলিত হয়। উপরন্তু তাহারা যদি ব্যোমকেশ বক্সীর নাম শুনিতে পায় তাহা হইলে তাহাদের হৃদয়াবেগ বাঁধ-ভাঙা বন্যার মতো দু'কূল ছাপাইয়া প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন আর তাহাদের ঠেকাইয়া রাখা যায় না। নীলকণ্ঠ অধিকারী সেইজাতীয় লোক। তাহার মুখ দেখিয়া বুঝিলাম, ব্যোম-কেশকে অদেয় তাহার কিছুই নাই; প্রশ্নের উত্তর সে দিবেই, এমন কি, প্রশ্ন না করিলেও সে উত্তর দিবে।

ব্যোমকেশ বলিল,—'আপনাকে দেখে কাজের লোক মনে হচ্ছে। মিলের সব কাজ আপনিই দেখেন?'

নীলকণ্ঠ সহর্ষে হস্তঘর্ষণ করিল—'আজ্ঞে, কর্তাও দেখেন। উনি যখন থাকেন না তখন আমার ওপরেই সব ভার পড়ে।'

'কর্তা—মানে বিশ্বনাথবাবু—এখানে থাকেন না?'

'আজ্ঞে, এখানেই থাকেন। তবে মিল্-এর কাজকর্ম যখন কম থাকে তখন দু'চার দিনের জন্যে কলকাতা যান। কলকাতায় কর্তার ফ্যামিলি থাকেন।'

'বুঝেছি। তা কর্তা কতদিন কলকাতা যাননি?'

'মাসখানেক হবে। এখন কাজের চাপ বেশী—'

'আচ্ছা, ও-কথা থাক। অমৃত নামে বাঘমারি গ্রামের একটি ছোকরা সম্প্রতি মারা গেছে, তাকে আপনি চিনতেন?'

নীলকণ্ঠ উৎসুক স্বরে বলিল,—'চিনতাম বৈকি। অমৃত প্রায়ই কর্তার কাছে চাকরির জন্যে দরবার করতে আসত। কিন্তু—'

'সদানন্দ সুরকেও আপনি চিনতেন?'

নীলকণ্ঠ সংহত স্বরে বলিল,—'সদানন্দবাবু কাল রাত্রে বোমা ফেটে মারা গেছেন, আজ সকালে খবর পেয়েছি। সদানন্দবাবুকে ভালোরকম চিনতাম। আমাদের এখানে তাঁর খুব যাতায়াত ছিল।'

'কী উপলক্ষে যাতায়াত ছিল?'

'উপলক্ষ—কর্তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল। মাঝে মাঝে গদিতে এসে বসতেন, তামাক খেতেন, কর্তার সঙ্গে দু'দণ্ড বসে গল্পগাছা করতেন। এর বেশী উপলক্ষ কিছু ছিল না। তবে—' বলিয়া নীলকণ্ঠ থামিল।

'অর্থাৎ মোসায়েবি করতেন। তবে কি?'

'দিন দশেক আগে তিনি কর্তার কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করেছিলেন।'

'তাই নাকি! কত টাকা?'

'পাঁচশো।'

'হ্যাণ্ডনোট লিখে টাকা ধার নিয়েছিলেন?'

'আজ্ঞে না। কর্তা সদানন্দবাবুকে বিশ্বাস করতেন, বহিখাতায় সদানন্দবাবুর নামে পাঁচশো টাকা কর্জ লিখে টাকা দেওয়া হয়েছিল। টাকাটা বোধহয় ডুবল।' বলিয়া নীলকণ্ঠ দুঃখিতভাবে মাথা নাড়িল।

ব্যোমকেশ গালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল। কি ভাবিল জানি না, কিন্তু খানিক পরে বাহির হইতে ঘোড়ার চিঁহি-চিঁহি শব্দ শুনিয়া তাহার চমক ভাঙিল। সে মুখ তুলিয়া বলিল,—'ভালো কথা, অনেকগুলো ঘোড়া দেখলাম। সবগুলোই কি আপনাদের?'

নীলকণ্ঠ সোৎসাহে বলিল,—'আজ্ঞে সব আমাদের। কর্তার খুব ঘোড়ার শখ। ন'টা ঘোড়া আছে।'

'তাই নাকি! এতগুলো ঘোড়া কি করে? ট্রাক টানে?'

'ট্রাক তো টানেই। তা ছাড়া কর্তা নিজে ঘোড়ায় চড়তে ভালবাসেন। উনি কমবয়সে জকি ছিলেন কিনা—'

'নীলকণ্ঠ!—'

শব্দটা আমাদের পিছন দিক হইতে চাবুকের মতো আসিয়া নীলকণ্ঠের মুখে পড়িল। নীলকণ্ঠ ভীতমুখে চুপ করিল, আমরা একসঙ্গে পিছনে ঘাড় ফিরাইলাম।

দ্বারের সম্মুখে একটি লোক দাঁড়াইয়া আছে। বয়স আন্দাজ চল্লিশ, ক্ষীণখর্ব চেহারা, অস্থিসার মুখে বড় বড় চোখ, হাফ-প্যাণ্ট ও হাফ-শার্ট পরা শরীরে বিকলতা কিছু না থাকিলেও, জঙ্ঘার হাড়-ছুটি ধনুকের মতো বাঁকা। ইনিই যে মিল্-এর মালিক ভূতপূর্ব জকি বিশ্বনাথ মল্লিক তাহা নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিলাম।

বিশ্বনাথ মল্লিক নীলকণ্ঠের দিকেই চাহিয়া ছিলেন, পলকের জন্যও আমাদের দিকে চক্ষু ফিরান নাই। এখন তিনি ঘরের মধ্যে দুই পা অগ্রসর হইয়া আগের মতোই শাণিত কণ্ঠে নীলকণ্ঠকে বলিলেন,—'ইস্টিশানে মাল চালান যাচ্ছে, তুমি তদারক করো গিয়ে।'

নীলকণ্ঠ কশাহত ঘোড়ার মতো ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

এইবার বিশ্বনাথ মল্লিক আমাদের দিকে চক্ষু ফিরাইলেন। তাঁহার মুখ হইতে মালিক-সুলভ কঠোরতা অপগত হইয়া একটু

হাসির আভাস দেখা দিল। তিনি সহজ সুরে বলিলেন,—'নীলকণ্ঠ বড় বেশী কথা কয়। আমি আগে জকি ছিলাম, সেই খবর আপনাদের শোনাচ্ছিল বুঝি?'

ব্যোমকেশ একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল,—'ঘোড়ার কথা থেকে জকির কথা উঠে পড়ল।'

বিশ্বনাথবাবু মুখের সহাস্য ভঙ্গী করিলেন,—'নিজের লজ্জাকর অতীতের কথা সবাই চাপা দিতে চায়, আমার কিন্তু লজ্জা নেই। বরং দুঃখ আছে, যদি জকির কাজ ছেড়ে না দিতাম, এতদিনে হয়তো খীম সিং কি খাদে হয়ে দাঁড়াতাম। কিন্তু ও-কথা যাক। আপনি ব্যোমকেশবাবু—না? সদানন্দ সুরের মৃত্যু সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে এসেছেন? আসুন, আমার বসবার ঘরে যাওয়া যাক।'

সাত

বিশু মল্লিকের খাস কামরাটি আধুনিক প্রথায় টেবিল চেয়ার দিয়া সাজানো, বেশ ফিটফাট। আমরা উপবেশন করিলে তিনি টেবিলের দেরাজ হইতে সিগারেটের টিন বাহির করিয়া দিলেন।

বিশু মল্লিকের চেহারাটি অকিঞ্চিৎকর বটে, কিন্তু তাঁহার আচার-ব্যবহারে বেশ একটি আত্মপ্রত্যয়শীল ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, চোখদুটির অন্তরালে সজাগ শক্তিশালী মস্তিষ্কের ক্রিয়া চলিতেছে তাহাও বুঝিতে কষ্ট হয় না। আমাদের সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করিয়া তিনি নিজে সিগারেট ধরাইলেন; টেবিলের সামনের দিকে বসিয়া বলিলেন,—'ব্যোমকেশবাবু, আপনি কি জন্যে সান্তালগোলায় এসেছেন তা আমি জানি। বোধহয় এখানকার সকলেই জানে। এখন বলুন আমি কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি। অবশ্য নীলকণ্ঠর কাছে আমার সম্বন্ধে সব কথাই শুনেছেন। যদি আমাকেই গোলা-

বারুদের আসামী ব'লে সন্দেহ করেন তাহলে আমার মিল্ খুঁজে দেখতে পারেন, আমার কোনও আপত্তি নেই।'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল,—'খোঁজাখুঁজির কথা পরে হবে। এখন আমার একটি ব্যক্তিগত কৌতূহল চরিতার্থ করুন। জকির কাজ ছেড়ে চালের কল করলেন কেন? যতদূর জানি জকির কাজে পয়সা আছে।'

বিশুবাবু বলিলেন,—'পয়সা অবশ্য আছে, কিন্তু বড় কড়াকড়ির জীবন, ব্যোমকেশবাবু। কখন ওজন বেড়ে যাবে এই ভয়ে আধ-পেটা খেয়ে জীবন কাটাতে হয়। আরও অনেক বায়নাক্কা আছে। আমার পোষাল না। কিছু টাকা জমিয়েছিলাম, তাই দিয়ে যুদ্ধের আগে এই মিল্ খুলে বসলাম। তা, বলতে নেই, মন্দ চলছে না।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'কিন্তু ঘোড়ার মোহ ছাড়তে পারলেন না। এখানেও অনেকগুলি ঘোড়া পুষেছেন দেখলাম।'

বিশুবাবু ঈষৎ গাঢ়স্বরে বলিলেন,—'হ্যাঁ। আমি ঘোড়া ভালবাসি। অমন বুদ্ধিমান প্রভুভক্ত জানোয়ার আর নেই। মানুষের প্রকৃত বন্ধু যদি কেউ থাকে তো সে কুকুর নয়, ঘোড়া।'

'তা বটে।' ব্যোমকেশ চিন্তা করিতে করিতে বলিল,—'আমারও কুকুরের চেয়ে ঘোড়া ভালো লাগে। কত রঙের ঘোড়াই আছে; লাল সাদা কালো। তবে এদেশে লাল ঘোড়াই বেশী দেখা যায়, সাদা কালো তত বেশী নয়। এই দেখুন না, সান্তালগোলাতেই কত ঘোড়া চোখে পড়ল, কিন্তু সাদা বা কালো ঘোড়া একটাও দেখলাম না।'

বিশুবাবু বলিলেন,—'আপনি ঠিক বলেছেন। সাদা ঘোড়া এখানে একটাও নেই। তবে একটা কালো ঘোড়া আছে। বদ্রিদাস মাড়োয়ারীর।'

'বদ্রিদাস—সে কে?'

'এখানে আর-একটা চালের কল আছে, তার মালিক বদ্রিদাস গিরধরলাল। তার কয়েকটা ঘোড়া আছে, তাদের মধ্যে একটা ঘোড়া কালো।'

ব্যোমকেশ সিগারেটের শেষাংশ অ্যাশ-ট্রেতে ঘষিয়া নিভাইয়া দিল। ঘোড়া সম্বন্ধে তাহার কৌতূহল নিবৃত্ত হইয়াছে এমনি নিরুৎসুক স্বরে বলিল,—'কালো ঘোড়া আছে তাহলে।—যাক, এবার কাজের কথা বলি। আপনার কর্মচারীর কাছে কিছু খবর পেয়েছি, সে-সব কথা আবার জিজ্ঞেস করে সময় নষ্ট করব না। সদানন্দ সুরের মৃত্যু-সংবাদ আপনি পেয়েছেন। ঘটনাক্রমে আমি তখন বাঘমারি গ্রামে ছিলাম। ভয়াবহ মৃত্যু।'

বিশুবাবু বলিলেন,—'শুনেছি বোমা ফেটে মৃত্যু হয়েছে। আপনি দেখেছিলেন?'

ব্যোমকেশ সংক্ষেপে মৃত্যুর বিবরণ দিয়া বলিল,—'এখন শুধু সদানন্দ সুরের মৃত্যুর কিনারা নয়, বোমারও কিনারা করতে হবে। আপনি বুদ্ধিমান লোক, এ বিষয়ে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারেন।'

'কি ভাবে সাহায্য করতে পারি, বলুন।'

'আপনি এখানে অনেকদিন আছেন, এখানকার ঘাঁৎঘোঁৎ জানা আছে। মার্কিন সিপাহীর দল যখন এখানে ছিল তখন আপনিও ছিলেন। আপনি বলতে পারেন কারা মার্কিন সিপাহীদের ছাউনিতে যাতায়াত করত?'

বিশুবাবু কিছুক্ষণ নতনেত্রে চিন্তা করিয়া বলিলেন,—'মার্কিন সিপাহীদের ছাউনিতে কারুর যাতায়াত ছিল কিনা আমি বলতে পারি না, কিন্তু তাদের সর্বত্র যাতায়াত ছিল। ভারি মিশুক লোক ছিল তারা, আমার মিল্-এও অনেকবার এসেছে।'

'হুঁ। তারা আপনার কাছে অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করবার চেষ্টা করেছিল কি?'

বিশুবাবু একটু গম্ভীর হাসিলেন,—'করেছিল। একজন সার্জেণ্ট একটা পিস্তল বিক্রি করবার চেষ্টা করেছিল। আমি কিনিনি।'

'আপনি কেনেননি, আর কেউ কিনেছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, লোকটা কে। আপনি কিছু আন্দাজ করতে পারেন?'

'কিছু না। আন্দাজ করতে পারলে অনেক আগেই আপনাদের খবর দিতাম, ব্যোমকেশবাবু।'

ব্যোমকেশ আর-একটা সিগারেট ধরাইয়া কিছুক্ষণ নীরবে টানিল, —'আচ্ছা, আর একটা কথা। সান্তালগোলা ছোট জায়গা, এখানে মারণাস্ত্রগুলো যদি কেউ লুকিয়ে রাখতে চায় তাহলে কোথায় লুকিয়ে রাখবে আপনি অনুমান করতে পারেন?'

বিশুবাবু আবার কিছুক্ষণ চক্ষু নত করিয়া চিন্তা করিলেন, শেষে বলিলেন,—'আপনার বিশ্বাস মারণাস্ত্রগুলো সান্তালগোলাতেই আছে। কিন্তু তা নাও হতে পারে।'

'মনে করুন সান্তালগোলাতেই আছে।'

'বেশ, মনে করলাম। কিন্তু অস্ত্রগুলোর আয়তন কতখানি, ক'টা বন্দুক ক'টা বোমা এসব তো কিছুই আমি জানি না। কি করে অনুমান করব? আমার মনে হয় পুলিস যদি সান্তালগোলার সমস্ত বাড়ি, সমস্ত গোলা আর চালের কল একসঙ্গে খানাতল্লাশ করে তাহলে হয়তো অস্ত্রগুলো বেরুতে পারে।'

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িল,—'তা কি সম্ভব! আর যদি সম্ভব হত তাহলেও একটা কথা ভেবে দেখুন। যে-ব্যক্তি এই কাজ করছে সে নির্বোধ নয়, সে কি এমন জায়গায় মাল রাখবে যেখানে পুলিস সহজেই খুঁজে বার করতে পারে? আমার তা মনে হয় না। লোকটি যদি এত নির্বোধ হত তাহলে অনেক আগেই ধরা পড়ে যেত।'

বিশুবাবু উৎসুক স্বরে বলিলেন,—'তাহলে আপনার কী মনে হয়? কোথায় লুকিয়ে রাখতে পারে?'

ব্যোমকেশ খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল,—

'এমন জায়গায় রেখেছে যেখানে কারুর যেতে মানা নেই, অথচ কেউ যায় না, যেখানে দৈবাৎ মাল পাওয়া গেলেও প্রমাণ করা যাবে না কে রেখেছে।'

বিশুবাবু চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন,—'অর্থাৎ— ?'

ব্যোমকেশ পিছনের খোলা জানালা দিয়া অঙ্গুলি নির্দেশ করিল,—'অর্থাৎ ওই জঙ্গল। ওখানে ঝোপঝাড়ের মধ্যে কয়েকটা পিস্তল আর হ্যাণ্ড-গ্রিনেড পুঁতে রাখা খুব শক্ত কাজ নয়, কিন্তু খুঁজে বার করা অসম্ভব। যদি বা খুঁজে বার করলেন, কে পুঁতেছে কি করে প্রমাণ করবেন ?'

বিশুবাবু উৎসাহভরে বলিয়া উঠিলেন,—'ঠিক, ঠিক। জঙ্গলের কথাটা আমার মাথায় আসেনি। নিশ্চয় জঙ্গলে কোথাও পোঁতা আছে।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'অবশ্য আমার ভুলও হতে পারে। কিন্তু ভুল হয়েছে কিনা সেটা পরীক্ষা করে দেখা দরকার।'

বিশুবাবু বলিলেন,—'না ব্যোমকেশবাবু, আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমার বিশ্বাস আর দেরি না করে জঙ্গলটা খুঁজে দেখা দরকার।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'তাই করতে হবে। তবে জঙ্গল তো একটুখানি জায়গা নয়, খুঁজতে সময় লাগবে। অনেক লোকও লাগবে। আজ আর হবে না, কাল—'

এই পর্যন্ত বলিয়া ব্যোমকেশ থামিয়া গেল। এতক্ষণ সে অসতর্কভাবে কথা বলিতেছিল, এখন যেন রাশ টানিয়া নিজেকে সংযত করিল ; বিশুবাবুর পানে তীক্ষ্ণভাবে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—'বিশ্বনাথবাবু, আজ আপনাকে বিশ্বাস করে এমন কথা কিছু বললাম যা বাইরের লোকের কাছে বক্তব্য নয়। আপনি বিশ্বাসযোগ্য লোক বলেই বলেছি। আশা করি আমার বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন।'

বিশ্বনাথবাবু বলিলেন,—'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমার মুখ থেকে কোনো কথা বেরুবে না। উঠছেন নাকি ?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'হ্যাঁ, আজ উঠি। একবার ওই মাড়োয়ারী —কি নাম?—বদ্রিদাসের মিল্‌-এ যাব। দেখি যদি ওর কাছে কিছু খবর পাওয়া যায়। বিকেলে আবার রামডিহি যেতে হবে, সেখানে সদানন্দ সুরের ভগিনীপতি থাকেন।—আচ্ছা, সদানন্দবাবু যে আপনার কাছে পাঁচশো টাকা ধার নিয়েছিলেন, কিজন্যে ধার চান কিছু বলেছিলেন কি?'

বিশুবাবু বলিলেন,—'তাঁর ইচ্ছে ছিল এখানে কবিরাজী ওষুধের একটা দোকান খোলা। কিন্তু তাঁর মূলধন ছিল না, আমার কাছে ধার চেয়েছিলেন। লোকটি গরীব হলেও সজ্জন ছিলেন, আমি টাকা দিয়েছিলাম। তিনি বেঁচে থাকলে নিশ্চয় টাকা শোধ দিতেন, কিন্তু—! যাকগে, ও-ক'টা টাকার জন্যে আমার দুঃখ নেই। আমি শুধু ভাবছি, সদানন্দবাবুর মতো নিরীহ লোককে কে খুন করল? কেন খুন করল? তবে কি তাঁর একটা প্রচ্ছন্ন জীবন ছিল? বাইরে থেকে যা দেখা যেত সেটা তাঁর প্রকৃত স্বরূপ নয়?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'হয়তো তাই। এখনো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। আজ বিকেলে তাঁর ভগিনীপতির সঙ্গে দেখা হলে হয়তো তাঁর প্রকৃত চরিত্র বোঝা যাবে। আচ্ছা, আজ চলি, আবার দেখা হবে।'

দ্বার পর্যন্ত আসিয়া ব্যোমকেশ ফিরিয়া গেল, বিশুবাবুর পাশে দাঁড়াইয়া হ্রস্বকণ্ঠে বলিল,—'একটা কথা জিগ্যেস করা হয়নি। আপনি কি সম্প্রতি কোনো বেনামী চিঠি পেয়েছেন?'

বিশুবাবু চকিতে মুখ তুলিলেন,—'পেয়েছি। আপনি কি করে জানলেন?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আরও দু'একজন পেয়েছে, তাই মনে হল হয়তো আপনিও পেয়েছেন। কী আছে বেনামী চিঠিতে? ভয় দেখানো?'

'এই-যে দেখুন না'—বলিয়া বিশুবাবু দেরাজ হইতে আমাদেরই লেখা চিঠি বাহির করিয়া দিলেন।

ব্যোমকেশ মনোযোগ দিয়া চিঠি পড়িল, তারপর চিঠি ফেরত দিয়া বলিল,—'হুঁ। কে লিখেছে কিছু আন্দাজ করতে পারেন না?'

বিশুবাবু বলিলেন,—'কিছু না। আমার জীবনে এমন কোনও গুপ্তকথা নেই যা ভাঙিয়ে কেউ লাভ করতে পারে।'

'আপনার শত্রু কেউ আছে?'

'অনেক। ব্যবসাদারের সবাই শত্রু।'

'তাহলে তারাই কেউ হয়তো নিছক mischief করবার জন্যে চিঠি দিয়েছে।—চলি এবার। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।'

বিশুবাবু হাসিয়া বলিলেন,—'আমার মিল্ তাহলে সার্চ করছেন না?'

ব্যোমকেশও হাসিল,—'অনর্থক পণ্ডশ্রম করে লাভ কি বিশ্বনাথবাবু?'

'আর জঙ্গল?'

'সেটাও আজ নয়—জঙ্গল আপাদমস্তক খুঁজতে অনেক কাঠ-খড় চাই। এসো অজিত, রোদ ক্রমেই কড়া হচ্ছে। বদ্রিদাস মাড়োয়ারীর সঙ্গে দুটো কথা ব'লে চট্‌পট্ আস্তানায় ফিরতে হবে।'

আট

বদ্রিদাস মাড়োয়ারীর সঙ্গে আলাপ করিয়া কিন্তু সুখ হইল না।

মাড়োয়ারীদের মধ্যে প্রধানত দুই শ্রেণীর চেহারা দেখা যায়; এক, পাতিহাঁসের মতো মোটা আর বেঁটে; দুই, বকের মতো সরু আর লম্বা। বদ্রিদাসের আকৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীর। তাঁহার চালের কলটি আকারে প্রকারে বিশুবাবুর মিল্-এর অনুরূপ; সেই ধান শুকাইবার মেঝে, সেই পুকুর, সেই ইঞ্জিন-ঘর, সেই ফটকের সামনে

গুর্খা দরোয়ান। পৃথিবীর সমস্ত চালকলের মধ্যে বোধকরি আকৃতিগত ভ্রাতৃসম্বন্ধ আছে।

বদ্রিদাসের বয়স পঁয়ত্রিশ হইতে চল্লিশের মধ্যে। নিজের গদিতে বসিয়া খবরের কাগজ হইতে তেজি-মন্দার হাল জানিতেছিলেন, আমাদের দেখিয়া এবং পরিচয় শুনিয়া তাঁহার চক্ষুদুটি অতিমাত্রায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি গলা উঁচু করিয়া ঘরের আনাচে-কানাচে চকিত ক্ষিপ্র নেত্রপাত করিতে লাগিলেন, কিন্তু আমাদের সঙ্গে পলকের তরেও দৃষ্টি বিনিময় করিলেন না। ব্যোমকেশের প্রশ্নের উত্তরে তিনি যাহা বলিলেন তাহাও নিতান্ত সংক্ষিপ্ত এবং নেতি-বাচক। পুরা সওয়াল জবাব উদ্ধৃত করার প্রয়োজন নাই, নমুনা-স্বরূপ কয়েকটির উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে।—

'আপনি অমৃতকে চিনতেন?'

'নেহি।'

'সদানন্দ সুরকে চিনতেন?'

'নেহি।'

'বেনামী চিঠি পেয়েছেন?'

'নেহি।'

'আপনার কালো রঙের ঘোড়া আছে?'

'নেহি।'

আরও কিছুক্ষণ প্রশ্নোত্তরের পর ব্যোমকেশ উঠিয়া পড়িল; কঠিন দৃষ্টিতে বদ্রিদাসকে বিদ্ধ করিয়া বলিল,—'আজ চললাম, কিন্তু আবার আসব। এবার ওয়ারেণ্ট নিয়ে আসব, আপনার মিল্ সার্চ করব।'

বদ্রিদাস এককথার মানুষ, দু'রকম কথা বলেন না। বলিলেন,—'নেহি নেহি।'

উত্ত্যক্ত হইয়া চলিয়া আসিলাম। ফটকের বাহিরে পা দিয়াছি, একটি শীর্ণকায় বাঙালী আসিয়া আমাদের ধরিয়া ফেলিল; পানের

রসে আরক্ত দন্ত নিষ্ক্রান্ত করিয়া বলিল,—'আপনি ব্যোমকেশবাবু? বদ্রিদাসকে সওয়াল করছিলেন?'

ব্যোমকেশ ভ্রূ তুলিয়া বলিল,—'আপনি জানলেন কি করে? ঘরে তো কেউ ছিল না!'

রক্তদন্ত আরও প্রকট করিয়া লোকটি বলিল,—'আমি আড়াল থেকে সব শুনেছি। বদ্রিদাস আগাগোড়া মিছেকথা বলেছে। সে অমৃতকে চিনত, সদানন্দ সুরকে চিনত, বেনামী চিঠি পেয়েছে, ওর কালো রঙের একটা ঘোড়া আছে। ভারি ধূর্ত মাড়োয়ারী, পেটে-পেটে শয়তানি।'

ব্যোমকেশ লোকটিকে কিছুক্ষণ শান্তচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল,—'আপনি কে?'

'আমার নাম রাখাল দাস। মাড়োয়ারীর গদিতে কাজ করি।'

'আপনার চাকরি যাবার ভয় নেই?'

'চাকরি গিয়েছে। বদ্রিদাস লুটিস্ দিয়েছে, এই মাসের শেষেই চাকরি খালাস।'

'নোটিস দিয়েছে কেন?'

'মুলুক থেকে ওর জাতভাই এসেছে, তাকেই আমার জায়গায় বসাবে। বাঙালী রাখবে না।'

আমরা চলিতে আরম্ভ করিলাম। লোকটা আমাদের পিছন পিছন আসিতে লাগিল,—'মনে রাখবেন ব্যোমকেশবাবু, পাজির পা-ঝাড়া ওই বদ্রিদাস। ওর অসাধ্যি কম্ম নেই। জাল জুচ্চুরি কালোবাজার—'

ব্যোমকেশ পিছন ফিরিয়া চাহিল না, হাত নাড়িয়া তাহাকে বিদায় করিল।

বিশ্রান্তি-গৃহে ফিরিয়া ব্যোমকেশ আরামকেদারায় লম্বা হইল, ঊর্ধ্বে চাহিয়া বোধকরি ভগবানের উদ্দেশে বলিল,—'কত অজানারে জানাইলে তুমি!'

আমি জামা খুলিয়া বিছানার পাশে বসিলাম ; বলিলাম,—'ব্যোমকেশ, অনেক লোকের সঙ্গেই তো মূলাকাৎ করলে। কিছু বুঝলে ?'

সে বলিল,—'বুঝেছি সবই। কিন্তু লোকটিকে যতক্ষণ নিঃসংশয়ে চিনতে না পারছি ততক্ষণ বোঝাবুঝির কোনও মানে হয় না।'

'কালো ঘোড়ার ব্যাপারটা কি ? বদ্রিদাসের যদি কালো ঘোড়া থাকেই তাতে কী ?'

ব্যোমকেশ কতক নিজ মনেই বলিল,—'খট্‌কা লাগছে। বদ্রি-দাসের কালো ঘোড়া—খট্‌কা লাগছে !'

'তোমার ধারণা হত্যাকারী কালো ঘোড়ায় চড়ে সদানন্দ সুরকে খুন করতে গিয়েছিল। কিন্তু কেন ? ঘোড়ায় চড়ে গিয়ে লাভ কি ?'

'লাভ আছে, কিন্তু লোকসানও আছে। তাই ভাবছি—। যাক।' সে আমার দিকে ঘাড় ফিরাইয়া বলিল,—'বিশ্বনাথ মল্লিককে কেমন দেখলে ?'

বলিলাম,—'জকি ছিলেন, কুকুরের চেয়ে ঘোড়া ভালবাসেন ; এ থেকে ভালো-মন্দ কিছু বুঝলাম না ! কিন্তু ওঁকে হাঁড়ির খবর দেওয়া কি উচিত হয়েছে ? মনে করো, জঙ্গল সার্চ করার কথাটা যদি বেরিয়ে যায় ! আসামী সাবধান হবে না ?'

ব্যোমকেশ একটু বিমনা ভাবে বলিল,—'হুঁ। কিন্তু আমি তাঁকে চেতিয়ে দিয়েছি, আমার বিশ্বাস তিনি কাউকে বলবেন না।'

'কিন্তু যদি মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে যায় !'

'তাহলে ভাবনার কথা বটে।—যাক, নীলকণ্ঠ অধিকারীকেও বেশ সরল প্রকৃতির লোক বলে মনে হয়। ভারি প্রভুভক্ত, কী বলো ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু রাখাল দাস ?'

'ও একটা ছুঁচো। বদ্রিদাস তাড়িয়ে দিয়েছে, তাই গায়ের ঝাল মেটাতে এসেছিল।'

'কিন্তু ওর কথাগুলো কি মিথ্যে ?'

'না, সব সত্যি।'

দুপুরবেলা আহারাদির পর একটু বিশ্রাম করিয়া লইলাম। ব্যোমকেশের মুখখানা সারাক্ষণ চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হইয়া রহিল। উদ্বেগের হেতুটা কিন্তু ঠিক ধরিতে পারিলাম না।

বেলা সাড়ে চারটের সময় রামডিহি যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বাহির হইলাম। পৌনে-পাঁচটায় গাড়ী, পাঁচটা বাজিয়া দশ মিনিটে রামডিহি পৌঁছিবে। প্রাণকেষ্ট পালের সহিত সদালাপ করিয়া ফিরিতে বেশী রাত হইবে না।

টিকিট কিনিয়া প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করিলাম। ফটকে মনোতোষ টিকিট চেক্ করিয়া মিটিমিটি হাসিল,—'ফিরছেন কখন ?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'ন'টা-দশটা হবে !'

প্ল্যাটফর্মে কিছু যাত্রি সমাগম হইয়াছে। ট্রেন আসিতে মিনিট পাঁচেক দেরি আছে। এদিক ওদিক দৃষ্টি ফিরাইতে চোখে পড়িল ক্ষীণাঙ্গ স্টেশনমাস্টার হরিবিলাসবাবুর অফিসের সামনে দাঁড়াইয়া পীনাঙ্গ দারোগা সুখময়বাবু তাঁহার সহিত সতর্কভাবে কথা বলিতেছেন। সুখময়বাবু আমাদের দেখিতে পাইয়া হাত নাড়িলেন এবং অল্লক্ষণ পরেই আসিয়া হাজির হইলেন। তাঁহার চোখে অনুসন্ধিৎসার ঝিলিক।

'কোথাও যাচ্ছেন নাকি ?'

'রামডিহি যাব, একটু কাজ আছে। আপনি ?'

সুখময়বাবু বলিলেন,—'আমি কোথাও যাব না। একজনকে এগিয়ে নিতে এসেছি। এই ট্রেনেই তিনি আসছেন। হে-হে।' বলিয়া ভ্রূ নাচাইলেন।

ব্যোমকেশ একটু বিস্মিতস্বরে বলিল,—'কে তিনি ?'

সুখময়বাবু বলিলেন,—'তাঁর নাম নফর কুণ্ডু। তাঁর কয়েক বস্তা

চাল রেলে চালান যাচ্ছিল, একটা বস্তা ট্রেনের ঝাঁকানিতে ফেটে গিয়ে ভেতর থেকে দু'সের আফিম বেরিয়েছে। নফর কুণ্ডুও ধরা পড়েছেন। এই ট্রেনে তিনি আসছেন!' বলিয়া ভ্রূ নাচাইতে নাচাইতে স্টেশনমাস্টারের ঘরের দিকে প্রস্থান করিলেন।

ব্যোমকেশ ললাট কুঞ্চিত করিয়া চৌকা-পাথর-ঢাকা প্ল্যাটফর্মের দিকে চাহিয়া রহিল। আমি বলিলাম—'ওহে, বদ্রিদাস মাড়োয়ারীও এসেছেন।'

ব্যোমকেশ চকিতে চোখ তুলিল। মালগুদামের দিক হইতে বকের মতো পা ফেলিয়া শনৈঃ শনৈঃ বদ্রিদাস আসিতেছেন। তাঁহার ভাবভঙ্গী হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় তিনি আমাদের দেখিতে পাইয়াছেন। কিন্তু তিনি আমাদের দিকে চক্ষু ফিরাইলেন না, ধীর মন্থর পদে প্ল্যাটফর্ম হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

ব্যোমকেশের ভ্রূ-কুঞ্চন আরও গভীর হইল।

মিনিটখানেক পরে আমি বলিলাম,—'ওহে, বিশুবাবুও উপস্থিত। কী ব্যাপার বলো দেখি?'

যোধপুরী ব্রিচেস্ পরা বিশুবাবু ফটক দিয়া প্রবেশ করিলেন, আমাদের দেখিতে পাইয়া স্মিতমুখে আগাইয়া আসিলেন।

'নমস্কার। কোথাও যাচ্ছেন?'

'রামডিহি যাচ্ছি।'

'ওহো—সদানন্দ সুরের ভগিনীপতি!'

'হ্যাঁ। দশটার মধ্যেই ফিরব। আপনি?'

'একটা চালান আসবার কথা আছে, তারই খোঁজ নিতে এসেছি। দেখি যদি এসে থাকে।' অহিংসার মুখে একটু হাসিয়া তিনি মাল-অফিসের দিকে চলিয়া গেলেন।

ইতিমধ্যে ট্রেনের ধোঁয়া দেখা দিয়াছিল। অবিলম্বে প্যাসেঞ্জার গাড়ী আসিয়া পড়িল। গাড়ীতে উঠিবার আগে লক্ষ্য করিলাম, একটি তৃতীয় শ্রেণীর কামরা হইতে পুলিস-পরিবৃত একটি মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি

অবতরণ করিলেন। অনুমান করিলাম ইনিই আফিম-বিলাসী নফর কুণ্ডু। মনে পাপ ছিল বলিয়াই বোধহয় বেনামী চিঠি পাইয়া গা-ঢাকা দিয়াছিলেন।

দুই তিন মিনিট পরে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। ব্যোমকেশের মুখে সংশয়ের ভ্রূকুটি গাঢ়তর হইয়াছে, যেন সে হঠাৎ কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইয়া মনস্থির করিতে পারিতেছে না। জিজ্ঞাসা করিলাম,--'হ'ল কি? ঠেকায় পড়েছ মনে হচ্চে।'

সে উত্তর দিবার আগেই ঘ্যাঁচ করিয়া গাড়ী থামিয়া গেল। জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া দেখিলাম ডিস্টাণ্ট সিগনাল না পাইয়া গাড়ী থামিয়াছে। তারের বেড়ার ওপারে বাঘমারি গ্রাম দেখা যাইতেছে।

যেন সমস্ত সমস্যার সমাধান হইয়াছে এমনি ভাবে লাফাইয়া উঠিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—'ভালোই হ'ল। অজিত, আমি এখানে নেমে যাচ্ছি, তুমি একাই রামডিহি যাও। প্রাণকেষ্টবাবুকে সব কথা জিগ্যেস করবে। সদানন্দবাবু তাঁর কাছে তোরঙ্গ রেখে গিয়েছিলেন কিনা এ-কথাটা জানতে ভুলো না।—আচ্ছা।'

গাড়ী সিটি মারিয়া আবার গুটিগুটি চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, ব্যোমকেশ নামিয়া পড়িল। আমি হতবুদ্ধি হইয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া রহিলাম। সে তারের বেড়া পার হইয়া আমার উদ্দেশে একবার হাত নাড়িল, তারপর বাঘমারি গ্রামের দিকে চলিল।

নয়

ইতিপূর্বে ব্যোমকেশ কখনও আমাকে এমনভাবে ফেলিয়া পালায় নাই। মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। প্রাণকেষ্টবাবুকে কী জেরা করিব? ব্যোমকেশ যখন জেরা করে তখন তাহার প্রয়োগনৈপুণ্য

উপভোগ করিতে পারি, কিন্তু নিজে এ-কাজ কখনও করি নাই। শেষে কি ধাষ্টামো করিয়া বসিব! ব্যোমকেশ আমাকে' একি আতান্তরে ফেলিয়া গেল!

প্যাসেঞ্জার গাড়ী তুল্‌কি চালে চলিয়াছে; দু'তিন মাইল অন্তর ছোট ছোট স্টেশন, তবু অবিলম্বে গাড়ী রামডিহি পৌঁছিবে। সুতরাং এইবেলা মাথা ঠাণ্ডা করিয়া ভাবিয়া লওয়া দরকার। প্রথমেই ভাবিতে হইবে, প্রাণকেষ্টবাবুকে ব্যোমকেশ জেরা করিতে চায় কেন? প্রাণকেষ্টবাবু সদানন্দ সুরের ভগিনীপতি; সম্ভবত প্রাণকেষ্টবাবুর স্ত্রী সদানন্দবাবুর উত্তরাধিকারিণী, কারণ সদানন্দবাবুর নিকটআত্মীয় আর কেহ নাই।···সদানন্দবাবু কলিকাতা যাইবার পথে কি ভগিনীপতির কাছে লোহার তোরঙ্গ রাখিয়া গিয়াছিলেন? তোরঙ্গে কি কোনও মহামূল্য দ্রব্য ছিল? প্রাণকেষ্টবাবু কর্মসূত্রে এই পথ দিয়া ট্রলি চড়িয়া যাতায়াত করিতেন; তাঁহার পক্ষে ট্রলি হইতে নামিয়া বাঘমারি গ্রামে উপস্থিত হওয়া মোটেই শক্ত নয়। তবে কি ব্যোমকেশের সন্দেহ প্রাণকেষ্টবাবুই শ্যালককে সংহার করিয়াছেন?···

রামডিহি জংশনে পৌঁছিয়া প্রাণকেষ্ট পালের ঠিকানা পাইতে বিলম্ব হইল না। স্টেশনের সন্নিকটে তারের বেড়া দিয়া ঘেরা কয়েকটি ছোট ছোট কুঠি, তাহারই একটাতে প্রাণকেষ্টবাবু বাস করেন। কুঠির সামনে ছোট্ট বাগান; প্যান্টুলুন ও হাত-কাটা গেঞ্জি পরা একটি পুষ্টকায় ব্যক্তি হাতে খুরপি লইয়া বাগানের পরিচর্যা করিতেছিলেন, আমাকে দেখিয়া ফ্যালফ্যাল চক্ষে চাহিয়া রহিলেন।

জিজ্ঞাসা করিলাম,—'আপনিই কি প্রাণকেষ্ট পাল?'

তাঁহার হাত হইতে খুরপি পড়িয়া গেল। তিনি কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া থাকিয়া বিহ্বলভাবে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িলেন। বলিলাম, —'আমি পুলিসের পক্ষ থেকে আসছি। খবর পেয়েছেন বোধহয় আপনার শালা সদানন্দ সুর মারা গেছেন।'

এই প্রশ্নে ভদ্রলোক এমন স্তম্ভিত হইয়া গেলেন যে, মনে হইল তাঁহার প্যাণ্টুলুন এখনি খসিয়া পড়িবে। তারপর তিনি চমকিয়া উঠিয়া 'সুশীলা! সুশীলা!' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন।

আমিও কম স্তম্ভিত হই নাই। মনে-মনে যাঁহাকে দুর্দান্ত শ্যালক-হন্তা বলিয়া আঁচ করিয়াছি তাঁহার এইরূপ আচার-আচরণ! পুলিসের নাম শুনিয়াই শিথিলাঙ্গ হইয়া পড়িলেন! কিম্বা—এটা একটা ভান মাত্র। ঘাগী অপরাধীরা পুলিসের চোখে ধূলা দিবার জন্য নানাপ্রকার ছলচাতুরি অবলম্বন করে—প্রাণকেষ্টবাবু কি তাহাই করিতেছেন? সুশীলাই বা কে? তাঁহার স্ত্রী?

পাঁচ মিনিট কাটিয়া গেল, বাড়ির ভিতর হইতে সাড়াশব্দ নাই। অতঃপর কী করিব, ডাকাডাকি করিব কি ফিরিয়া যাইব, এইসব ভাবিতেছি, এমন সময় দ্বারের কাছে প্রাণকেষ্টবাবুকে দেখা গেল। তিনি যেন কতকটা ধাতস্থ হইয়াছেন; প্যাণ্টুলুন যথাস্থানে আছে বটে, কিন্তু হাত-কাটা গেঞ্জির উপর বুশ-কোট চড়াইয়াছেন। মুখে মুমূর্ষু হাসি আনিয়া বলিলেন,—'আসুন।'

সামনের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিলাম। ঘরটি ছোট, কয়েকটি সস্তা বেতের চেয়ার ও টেবিল দিয়া সাজানো, অন্দরে যাইবার দরজায় পর্দা; বিলাতী অনুকৃতির মধ্যেও একটু পরিচ্ছন্নতা আছে। আমি অন্দরে যাইবার দরজার দিকে পিছন করিয়া বসিলাম, প্রাণকেষ্টবাবু আমার মুখোমুখি বসিলেন।

শুরু করিলাম,—'আপনার শালা সদানন্দবাবুর মৃত্যু-সংবাদ পেয়েছেন তাহলে?'

প্রাণকেষ্ট চমকিয়া বলিলেন,—'অ্যাঁ—হ্যাঁ।'

'কখন খবর পেলেন?'

'অ্যাঁ—সকালবেলা।'

'কার মুখে খবর পেলেন?'

'অ্যা—সান্তালগোলা থেকে হরিবিলাসবাবু টেলিফোন করেছিলেন।'

'মাফ করবেন, আপনার স্ত্রী, মানে সদানন্দবাবুর ভগ্নী কি এখানে আছেন?'

দেখিলাম আমার প্রশ্নের উত্তর দিবার আগে প্রাণকেষ্টবাবুর চক্ষুদুটি আমার মুখ ছাড়িয়া আমার পিছন দিকে চলিয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিল।

'হ্যাঁ—আছেন।'

আমি পিছনে ঘাড় ফিরাইলাম। অন্দরের পর্দা একটু ফাঁক হইয়া ছিল, চকিতে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইল। বুঝিতে বাকি রহিল না, পর্দার আড়ালে আছেন পত্নী সুশীলা এবং নেপথ্য হইতে প্রাণকেষ্টবাবুকে পরিচালিত করিতেছেন।

'আপনার স্ত্রী নিশ্চয় খুব শোক পেয়েছেন?'

আবার প্রাণকেষ্টবাবুর চকিত চক্ষু পিছন দিকে গিয়া ফিরিয়া আসিল।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়, খুব শোক পেয়েছেন।'

'আপনার স্ত্রী সদানন্দবাবুর উত্তরাধিকারিণী?'

'তা—তা তো জানি না। মানে—'

'সদানন্দবাবুর সঙ্গে আপনার সদ্ভাব ছিল?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব সদ্ভাব ছিল।'

'যাওয়া-আসা ছিল?'

'তা ছিল বৈকি। মানে—'

তাঁহার চক্ষু আবার পর্দার পানে ধাবিত হইল,—'অ্যা—মানে—বেশী যাওয়া-আসা ছিল না। কালেভদ্রে—'

'শেষ কবে দেখা হয়েছে?'

'শেষ? অ্যা—ঠিক মনে পড়ছে না—'

'দশ-বারো দিন আগে তিনি আপনার বাসায় আসেননি?'

প্রাণকেষ্টবাবুর চক্ষুদুটি ভয়ার্ত হইয়া উঠিল,—'কৈ না তো !'

'তিনি কলকাতা যাবার আগে আপনার কাছে একটা স্টীলের ট্রাঙ্ক রেখে যাননি ?'

প্রাণকেষ্টবাবুর দেহ কাঁপিয়া উঠিল,—'না না, স্টীলের ট্রাঙ্ক—না না, কৈ আমি তো কিছু—'

আমি কড়া সুরে বলিলাম,—'আপনি এত নার্ভাস হয়ে পড়ছেন কেন ?'

'নার্ভাস ! না না—'

পর্দা সরাইয়া প্রাণকেষ্টবাবুর স্ত্রী প্রবেশ করিলেন। স্বামীর চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন,—'আমার স্বামী নার্ভাস প্রকৃতির মানুষ, অচেনা লোক দেখলে আরও নার্ভাস হয়ে পড়েন। আপনি কি জানতে চান আমাকে বলুন।'

মহিলাকে দেখিলাম। বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ, দৃঢ়গঠিত দেহ, চোয়ালের হাড় মজবুত, চোখের দৃষ্টি প্রখর। মুখমণ্ডলে ভ্রাতৃশোকের কোনও চিহ্নই নাই ; তিনি যে অতি জবরদস্ত মহিলা তাহা বুঝিতে তিলার্ধ বিলম্ব হইল না। আমি উঠিয়া পড়িলাম,—'আমার যা জানবার ছিল জেনেছি, আর কিছু জানবার নেই। নমস্কার।' শ্রীমতী সুশীলাকে জেরা করা আমার কর্ম নয়।

স্টেশনে গিয়া জানিতে পারিলাম, ন'টার আগে ফিরিবার ট্রেন নাই। দীর্ঘ আড়াই ঘণ্টা কাটাইবার জন্য স্টেশনের স্টলে চা খাইলাম, অসংখ্য সিগারেট পোড়াইয়া প্ল্যাটফর্মে পাদচারণ করিলাম, এবং সস্ত্রীক প্রাণকেষ্টবাবুর কথা চিন্তা করিলাম।

প্রাণকেষ্ট পাল নার্ভাস প্রকৃতির মানুষ হইতে পারেন ; কিন্তু তিনি যে আমাকে দেখিয়া এত বেশী নার্ভাস হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহা কেবল ধাতুগত স্নায়বিক দুর্বলতা নয়, অন্য কারণও আছে। কী সে কারণ ? প্রাণকেষ্ট পত্নীর ইশারায় আমার কাছে অনেকগুলা

মিথ্যাকথা বলিয়াছিলেন। কী সে মিথ্যাকথা? সদানন্দ সুরের সহিত বেশী সম্প্রীতি না থাক, সদানন্দ সুর তাঁহার বাড়িতে যাতায়াত করিতেন। দশ-বারো দিন আগে কলিকাতায় যাইবার মুখে তিনি স্টীলের ট্রাঙ্কটি নিশ্চয় ভগিনীপতির গৃহে রাখিয়া গিয়াছিলেন। ট্রাঙ্কে নিশ্চয় কোনও মূল্যবান দ্রব্য ছিল। কী মূল্যবান দ্রব্য ছিল? টাকাকড়ি? গহনা? বোমাবারুদ? আন্দাজ করা শক্ত। কিন্তু শ্রীমতী সুশীলা বাক্সে কী আছে জানিবার কৌতূহল সংবরণ করিতে পারেন নাই, হয়তো তালা ভাঙিয়াছিলেন! তাঁহার মতো জবরদস্ত মহিলার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। কিন্তু তারপর? তারপর হয়তো ট্রাঙ্কে এমন কিছু পাওয়া গেল যে সদানন্দ সুরকে খুন করা প্রয়োজন হইল। হয়তো ট্রাঙ্কে হ্যাণ্ড-গ্রিনেড ছিল, সেই হ্যাণ্ড-গ্রিনেড দিয়াই সদানন্দকে—

কিন্তু না। শ্রীমতী সুশীলা যত দুর্ধর্ষ মহিলাই হোন, নিজের জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে খুন করিবেন? আর প্রাণকেষ্ট পালের পক্ষে এরূপ একটা দুঃসাহসিক কার্যে লিপ্ত হওয়া একেবারেই অসম্ভব।···কিন্তু স্টেশনমাস্টার হরিবিলাসবাবু বন্ধুকে অশুভ সংবাদটা সাত-তাড়াতাড়ি দিতে গেলেন কেন? বন্ধুসুলভ সহানুভূতি?···

সাড়ে ন'টার সময় সান্তালগোলায় ফিরিলাম। আকাশে চাঁদ আছে, শহর-বাজার নিষুতি হইয়া গিয়াছে। ভাবিয়াছিলাম বিশ্রান্তিগৃহে আসিয়া দেখিব ব্যোমকেশ ফিরিয়াছে। কিন্তু তাহার দেখা নাই। কোথায় গেল সে?

বিশ্রান্তিগৃহের চাকরটা রন্ধন শেষ করিয়া বারান্দায় বসিয়া ঢুলিতেছিল, তাহাকে খাবার ঢাকা দিয়া গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিলাম। সে চলিয়া গেল।

কেরোসিনের বাতি কমাইয়া দিয়া বিছানায় অঙ্গ প্রসারিত করিলাম। পিছনের জানালা দিয়া চাঁদের আলো আসিতেছে।···

কোথায় গেল ব্যোমকেশ ? বলা নাই কহা নাই ট্রেন হইতে নামিয়া চলিয়া গেল। বাঘমারি গ্রামে তার কী কাজ ? এতক্ষণ সেখানে কী করিতেছে !

ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম ; ঘুম ভাঙিল কানের কাছে ব্যোমকেশের ফিসফিস গলার শব্দে,—'অজিত, ওঠো, একটা জিনিস দেখবে এস।'

ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম,—'কী— ?'

'চুপ ! আস্তে !' ব্যোমকেশ হাত ধরিয়া আমাকে বিছানা হইতে নামাইল, তারপর পিছনের জানালার দিকে টানিয়া লইয়া গেল ; বাহিরের দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল,—'দেখছ ?'

ঘুমের ঘোর তখনও ভালো করিয়া কাটে নাই, ব্যোমকেশের ভাবভঙ্গী দেখিয়া মনে হইয়াছিল না জানি কী দেখিব ! কিন্তু যাহা দেখিলাম তাহাতে বোকার মতো চাহিয়া রহিলাম। জানালা হইতে পনরো-কুড়ি হাত দূরে ঝোপঝাড় আগাছার মাঝখানে খানিকটা মুক্ত স্থান, সেইখানে ছয়-সাতটা কৃষ্ণবর্ণ জন্তু অর্ধবৃত্তাকারে বসিয়া ঘাড় উঁচু করিয়া চাঁদের পানে চাহিয়া আছে। প্রথমদর্শনে মনে হইল কৃষ্ণকায় কয়েকটা কুকুর। বলিলাম,—'কালো কুকুর।' কিন্তু পরক্ষণেই যখন তাহারা সমস্বরে হুক্কা-হুয়া করিয়া উঠিল তখন আর সংশয় রহিল না। স্থানীয় শৃগালের দল চন্দ্রালোকে সঙ্গীত-সভা আহ্বান করিয়াছে।

আমার মুখের ভাব দেখিয়া ব্যোমকেশ হো-হো শব্দে অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। শৃগালের দল চমকিয়া পলায়ন করিল। আমি বলিলাম,—'এর মানে ? দুপুর রাত্রে আমাকে শেয়াল দেখাবার কী দরকার ছিল ?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আগে কখনো চাঁদের আলোয় শেয়াল দেখেছ ?'

'চাঁদের আলোয় শেয়াল দেখলে কী হয় ?'

'পুণ্য হয়, অজ্ঞানতিমির নাশ হয়। আমার মনে যেটুকু সংশয় ছিল তা এবার দূর হয়েছে। চলো এখন খাওয়া যাক, পেট চুঁই-চুঁই করছে।'

আলো বাড়াইয়া দিয়া টেবিলে খাইতে বসিলাম। লক্ষ্য করিলাম, ব্যোমকেশ ক্ষুধার্তভাবে অন্নগ্রাস মুখে পুরিতেছে বটে, কিন্তু তাহার মুখ হর্ষোৎফুল্ল। জিজ্ঞাসা করিলাম,—'এত ফুর্তি কিসের? দুপুর রাত পর্যন্ত ছিলে কোথায়? বাঘমারিতে?'

সে বলিল,—'বাঘমারির কাজ ন'টার মধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। তারপর—'

'বাঘমারিতে কী কাজ ছিল?'

'পটল, দাশু আর গোপালের সঙ্গে কাজ ছিল।'

'হুঁ, কী কাজ ছিল বলবে না। যাক, তারপর?'

'তারপর সান্তালগোলায় ফিরে এসে সুখময় দারোগার কাছে গেলাম। সেখানে একঘণ্টা কাটল। তারপর গেলাম স্টেশনে। হরিবিলাসবাবু ছিলেন না, তাঁকে বিছানা থেকে ধরে নিয়ে এলাম। লম্বা টেলিফোন করতে হ'ল। এখানকার থানায় পাঁচটি বৈ লোক নেই। কাল সকালে বাইরে থেকে দশজন আসবে। সব ব্যবস্থা করে ফিরে এলাম।'

জিজ্ঞাসা করিলাম,—'প্রাণকেষ্ট পালের কথা জানবার দরকার নেই তাহলে?'

'আছে বৈকি। কি হ'ল সেখানে?'

সব কথা মাছিমারা ভাবে বয়ান করিলাম। সে মন দিয়া শুনিল, কিন্তু বিশেষ আগ্রহ দেখাইল না। আহারান্তে মুখ ধুইতে ধুইতে বলিল,—'জোড়ার একটা যদি হয় গবেট, অন্যটা হয় বিচ্ছু। প্রকৃতির এই বিধান।'

অতঃপর সিগারেট ধরানো হইলে বলিলাম,—'তোমার পকেটে ওটা কি?'

ব্যোমকেশ একটু চকিত হইল, একটু লজ্জিত হইল। বলিল,—'বন্দুক—মানে, পিস্তল।'

'কোথায় পেলে?'

'থানায়। সুখময় দারোগার পিস্তল।'

'হুঁ। কোনও কথাই পষ্ট করে বলতে চাও না। বেশ, তাহলে এবার শুয়ে পড়া যাক।'

'তুমি শুয়ে পড়, আমাকে রাতটা জেগেই কাটাতে হবে।'

'কেন?'

'যাঁর হাতে হ্যাণ্ড-গ্রিনেড আছে তিনি যদি ভয় পেয়ে থাকেন তাহলে সাবধান থাকা ভালো।'

'তবে আমিও জেগে থাকি।'

রাত্রিটা জাগিয়া কাটিল। সুখের বিষয় কোনও উৎপাত হয় নাই। শেষরাত্রে চা পান করিতে করিতে ব্যোমকেশ মুখের বন্ধন একটু আলগা করিল, আমাদের অচিন পাখির নাম জানিতে পারিলাম।

দশ

সকাল সাতটার সময় দুইজনে বাহির হইলাম। ব্যোমকেশ গায়ে একটা উড়ানি-চাদর জড়াইয়া লইল, যাহাতে পকেটের পিস্তলটা দৃষ্টি আকর্ষণ না করে।

গঞ্জ-গোলার কর্মতৎপরতা এখনও পুরাদমে আরম্ভ হয় নাই, দুই-চারিটা গরুর গাড়ী ও ঘোড়ার ট্রাক্ চলিতে শুরু করিয়াছে। আমরা বদ্রিদাস মাড়োয়ারীর মিল্-এ প্রবেশ করিলাম।

বদ্রিদাস দাওয়ায় উবু হইয়া বসিয়া দাঁতন করিতেছিলেন, পাশে জলভরা ঘটি। আমাদের প্রথমটা দেখিতে পান নাই, একেবারে কাছে পৌঁছিলে দেখিতে পাইয়া তাঁহার চক্ষুদুটি খাঁচার পাখির মতো

ঝট্‌পট করিয়া এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে লাগিল, হাত হইতে দাঁতন পড়িয়া গেল।

ব্যোমকেশ বলিল,—'শেঠজি, আপনাকে একবার আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।'

বদ্রিদাস উবু অবস্থা হইতে অর্ধোত্থিত হইয়া আবার বসিয়া পড়িলেন,—'ক্যা—ক্যা—!'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আমরা একজায়গায় খানাতল্লাশ করতে যাচ্ছি, আপনি এখানকার গণ্যমান্য লোক, আপনাকে সাক্ষী মানতে চাই।

'নেহি, নেহি'—বলিতে বলিতে তিনি জলভরা ঘটিটা তুলিয়া লইয়া দ্রুতপদে বিশেষ একটি স্থানের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিলেন।

আমরা আবার বাহির হইলাম। বিশ্বনাথ মল্লিকের মিল্‌-এ পৌঁছিতে পাঁচ মিনিট লাগিল।

ফটকের কাছে নায়েব-সরকার নীলকণ্ঠ অধিকারীর সঙ্গে দেখা হইল। নীলকণ্ঠ ভক্তিভরে যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া বলিল,—'এত সকালে?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আপনার কর্তা কোথায়?'

'নিজের ঘরে আছেন। চা খাচ্ছেন।'

'চলুন তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসি।'

'আসুন।'

বিশ্বনাথ মল্লিক নিজের ঘরে টেবিলে বসিয়া পাঁউরুটি, মাখন ও অর্ধসিদ্ধ ডিম্ব সহযোগে প্রাতরাশ সম্পন্ন করিতেছিলেন, আমাদের দেখিয়া তাঁহার চোয়ালের চর্বণক্রিয়া বন্ধ হইল। গলা হইতে অস্বাভাবিক স্বর নির্গত হইল,—'ব্যোমকেশবাবু!'

ব্যোমকেশবাবু বলিল,—'সকালবেলাই আসতে হ'ল। কিন্তু তাড়া নেই, আপনি খাওয়া শেষ করে নিন।'

বিশুবাবু ডিমের প্লেট সরাইয়া দিয়া জড়িতস্বরে বলিলেন,—'কি

দরকার?' দেখিলাম তাঁহার অস্থিসার মুখখানা ধীরে ধীরে বিবর্ণ হইয়া যাইতেছে।

ব্যোমকেশ বলিল,—'কাল ভেবেছিলাম আপনার মিল্ খানা-তল্লাশ করে কোনও লাভ নেই। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে লাভ থাকতেও পারে।'

বিশুবাবুর রগের শিরা ফুলিয়া উঁচু হইয়া উঠিল, মনে হইল তিনি বিস্ফোরকের মতো ফাটিয়া পড়িবেন। কিন্তু তিনি অতি যত্নে নিজেকে সংবরণ করিলেন, তাঁহার ঠোঁটে হাসির মতো একটা ভঙ্গিমা দেখা দিল। তিনি বলিলেন,—'হঠাৎ মত বদলে ফেললেন কেন?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'কারণ ঘটেছে। কাল বিকেলে আমি রামডিহি যাইনি, আপনাদের ওই জঙ্গলে শিমুলগাছের কাছে লুকিয়ে ছিলাম। আমার সঙ্গে গাঁয়ের তিনটি ছেলে ছিল। আমরা কাল রাত্রে যা দেখেছি তার ফলে মত বদলাতে হয়েছে, বিশ্বনাথবাবু।'

বিশ্বনাথবাবুর চোখদুটো একবার জ্বলিয়া উঠিয়াই নিভিয়া গেল। তিনি কম্পিতহস্তে একটা সিগারেট ধরাইলেন, অলসভাবে বুক-পকেট হইতে একটা চাবির রিঙ বাহির করিয়া আঙুলে ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিলেন,—'আমি যদি আমার মিল্ খানাতল্লাশ করতে না দিই?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আপনার ইচ্ছের ওপর কিছুই নির্ভর করছে না। আমি তল্লাশী পরোয়ানা এনেছি।'

'কৈ দেখি পরোয়ানা।'

ব্যোমকেশ পকেটে হাত দিল, বিশুবাবু বিদ্যুৎবেগে চাবি দিয়া দেরাজ খুলিবার উপক্রম করিলেন। ব্যোমকেশ পকেট হইতে হাত বাহির করিল, হাতে পিস্তল। সে বলিল,—'দেরাজ খুলবেন না।'

কোণ-ঠাসা বনবিড়ালের মতো বিশু মল্লিক ঘাড় ফিরাইলেন; ব্যোমকেশের হাতে পিস্তল দেখিয়া তিনি দেরাজ খোলার চেষ্টা ত্যাগ করিলেন, তাঁহার মুখ দিয়া শীৎকারের মতো একটা তর্জন-শ্বাস বাহির হইল।

ব্যোমকেশ বলিল,—'অজিত, বাঁশী বাজাও।'

পুলিসের বাঁশী পকেটে লইয়া আমি প্রস্তুত ছিলাম, এখন সবেগে তাহাতে ফুৎকার দিলাম।

মিনিটখানেকের মধ্যে দারোগা সুখময় সামন্ত ও তাঁহার অনুচর-বর্গে ঘর ভরিয়া গেল। ব্যোমকেশ বলিল,—'ইন্সপেক্টর সামন্ত, বিশ্বনাথ মল্লিককে অ্যারেস্ট করুন, হাতে হাতকড়া পরান। ওঁর হাতে চাবি আছে, চাবি দিয়ে দেরাজ খুলুন। সাবধানে খুলবেন, অস্ত্রগুলো দেরাজের মধ্যেই আছে।'

বিশ্বনাথ মল্লিককে সহজে গ্রেপ্তার করা গেল না, তিনি বন-বিড়ালের মতোই আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া লড়াই করিলেন। অবশেষে পাঁচ ছয় জন মিলিয়া তাঁহাকে চাপিয়া ধরিয়া হাতে হাতকড়া পরাইল। তারপর টেবিলের দেরাজ খুলিয়া দেখা গেল তাহাতে ছাব্বিশটি ·৩৮ অটোম্যাটিক, অসংখ্য কার্তুজ এবং চৌদ্দটি হ্যাণ্ড-গ্রিনেড আছে। কালাবাজারে এগুলির দাম অন্তত বিশ হাজার টাকা।

বিশ্বনাথ মল্লিক পুলিস পরিবৃত হইয়া দাঁড়াইয়া নিষ্ফল ক্রোধে ফুলিতেছিলেন, হঠাৎ উগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—'বেশ, আমি চোরা-হাতিয়ারের কারবার করি। কিন্তু অমৃতকে আর সদানন্দ সুরকে খুন করেছি তার কোনো প্রমাণ আছে?'

ব্যোমকেশ শান্তকণ্ঠে বলিল,—'প্রমাণ আছে কিনা সে-বিচার আদালত করবেন। কিন্তু মোটিভ যথেষ্ট ছিল। আর আপনি যে-পিস্তল দিয়ে অমৃতকে মেরেছিলেন সে-পিস্তলটা এর মধ্যেই আছে। গুলীটাও অমৃতের শরীরের মধ্যে পাওয়া গেছে। Ballistic পরীক্ষায় সেটা প্রমাণ করা শক্ত হবে না।'

বিশ্বনাথ মল্লিকের চোখদুটা ঘোলা হইয়া গেল, তিনি হাতকড়া-সুদ্ধ দুই হাত দিয়া নিজের কপালে সজোরে আঘাত করিয়া এলাইয়া পড়িলেন।

এগারো

সেদিন বেলা তৃতীয় প্রহরে মধ্যাহ্ন-ভোজন সম্পন্ন করিয়া আমরা বিশ্রান্তিগৃহের দুইটি খাটে লম্বমান হইয়াছিলাম। পটল, দাশু ও গোপাল বারংবার ব্যোমকেশের পদধূলি গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিয়াছে। দারোগা সুখময় সামন্ত আসামীকে সদরে চালান দিয়া স্তূপীকৃত হাঁসের ডিমের বড়া খাইতে খাইতে থানার অন্যান্য কর্মচারীদের নিকট ইহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন যে, আসামীর গ্রেপ্তারের ব্যাপারে তাঁহার কৃতিত্বও কম নয়। গঞ্জের কর্মতৎপরতা ক্ষণকালের জন্য মন্দীভূত হইলেও আবার পুরাদমে চালু হইয়াছে ঃ রামে রাম দুয়ে দুই। অমৃত এবং সদানন্দ সুর নামক দুটি অখ্যাত ব্যক্তির অকালমৃত্যু ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে জীবনের নিত্যস্রোত ব্যাহত হয় নাই। এবং তাহাদের আততায়ী ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিলেও ব্যাহত হইবে না।···রামে রাম দুয়ে দুই।··· রাম নাম সত্য হ্যায়।···

ব্যোমকেশ ঊর্ধ্বদিকে চাহিয়া চাহিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল ; বলিল,—'সদানন্দ সুরের মৃত্যুতে আমার দুঃখ নেই। কিন্তু অমৃত ছেলেটা নেহাত অকারণেই মারা গেল।'

আমি একটা নূতন সিগারেট ধরাইয়া বলিলাম,—'গোড়া থেকে বলো।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'এ কাহিনীর গোড়া হচ্ছেন সদানন্দ সুর। তিনি না থাকলে আমরা চোরা-কারবারী আসামীকে ধরতে পারতাম না। তাঁকে দিয়েই কাহিনী শুরু করা যেতে পারে।'—

সদানন্দ সুরের চরিত্র যতটুকু বুঝেছি, তিনি ছিলেন কৃপণ এবং সংবৃতমন্ত্র। নিজের হাঁড়ির খবর কাউকে দিতে ভালবাসতেন না।

অবস্থাও ছিল অত্যন্ত সাধারণ। বোনের বিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু নিজে বিয়ে করেননি। পৈতৃক ভিটে এবং দু'চার বিঘে জমি; সান্তালগোলার বাজারে দু'চার মণ ধান-চালের দালালি; কবিরাজি ওষুধ বিক্রি ক'রে দু'চার পয়সা লাভ;—এই ছিল তাঁর অবলম্বন। একলা মানুষ, তাই কোনওরকমে চলে যেত।

কিন্তু তাঁর মনে ভোগতৃষ্ণা ছিল। কৃপণেরা গাঁটের পয়সা খরচ করে ভোগতৃষ্ণা মেটাতে চায় না বটে, তাই বলে তাদের ভোগতৃষ্ণা নেই এ-কথা কেউ বলবে না। সদানন্দবাবুর সাধ ছিল, সাধ্য ছিল না। হয়তো তিনি তাঁর ক্ষুদ্র রোজগার থেকে দু'চার পয়সা বাঁচাতেন, কিন্তু তা নিয়ে ফুর্তি করার মতো চরিত্র তার নয়। এইভাবে জীবন কাটছিল। বয়স বাড়ছে, শক্তি-সামর্থ্য ফুরিয়ে আসছে। হয়তো এমনি বুভুক্ষু অবস্থাতেই তাঁর জীবন শেষ হ'ত। হঠাৎ পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে একটা মস্ত সুযোগ জুটে গেল।

বিশ্বনাথ মল্লিকের কাছে সদানন্দবাবুর যাতায়াত ছিল। বিশ্বনাথ মল্লিকের দেরাজে কবিরাজি মোদকের শিশি পাওয়া গেছে, নিশ্চয় সদানন্দবাবু যোগান দিতেন। এই সূত্রেই ঘনিষ্ঠতা। তারপর হঠাৎ একদিন সদানন্দবাবু বিশু মল্লিকের জীবনের গোপনতম কথাটি জানতে পারলেন। বিশু মল্লিক চোরা-অস্ত্রশস্ত্রের কারবারী। কি করে জানতে পারলেন বলা যায় না, সম্ভবত তিনি সন্ধান পেয়েছিলেন কোথায় বিশু মল্লিক তার অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখে। শিমুলগাছটা তাঁর বাড়ী থেকে বেশী দূরে নয়, হয়তো হঠাৎ বিশু মল্লিককে সেখানে দেখে ফেলেছিলেন।

সদানন্দবাবু গুপ্তস্থান থেকে বোমা-বন্দুক চুরি করতে পারতেন, কিন্তু তিনি সে-পথ দিয়ে গেলেন না। বোমা-বন্দুক কি করে কালো-বাজারে চালাতে হয়, পাড়াগেঁয়ে মানুষ সদানন্দ সুর তা জানতেন না। তিনি অন্য রাস্তা ধরলেন। বিশু মল্লিককে বললেন, টাকা দাও, নৈলে সব ফাঁস করে দেব। অর্থাৎ সোজাসুজি ব্ল্যাকমেল।

বিশু মল্লিক নিরুপায়। পাঁচশো টাকা বার করতে হ'ল। সেই টাকা নিয়ে সদানন্দবাবু বাড়ি ফিরে এলেন। ফুর্তির বয়স শেষ হয়ে আসছে, আর দেরি করা চলে না। তিনি স্থির করলেন কলকাতা যাবেন।

কিন্তু তিনি ভারি হিসেবী লোক, সব টাকা নিয়ে কলকাতা যাওয়া তাঁর মনোমতো নয়। অথচ বাঘমারির শূন্যবাড়িতে টাকা রেখে গেলেও ভয় আছে, চোর এসে সর্বস্ব নিয়ে যেতে পারে। তিনি একটি কাজ করলেন।

আমি তোমাকে যা বলছি তার অধিকাংশই আন্দাজ, কিন্তু এলোমেলো আন্দাজ নয়। সদানন্দ সুর একটি স্টিলের ট্রাঙ্কে বেশীর ভাগ টাকা রাখলেন, সঞ্চিত যা ছিল তা রাখলেন, হয়তো সাবেক কালের কিছু গয়নাগাঁটি ছিল তাও রাখলেন। তারপর একহাতে স্টিল-ট্রাঙ্ক এবং অন্যহাতে নিজের ব্যবহারের ক্যাম্বিস-ব্যাগ নিয়ে যাত্রা করলেন। রামডিহি স্টেশনে তাঁর বোন-ভগিনীপতি আছে, তাদের জিম্মায় ট্রাঙ্ক রেখে কলকাতায় যাবেন ফুর্তি করতে।

সদানন্দ সুর তো চলে গেলেন, এদিকে ফাঁপরে পড়েছে বিশু মল্লিক। এতদিন সে বেশ নিরুপদ্রবেই ব্যবসা চালাচ্ছিল, এখন দেখল সে বিষম ফাঁদে ধরা পড়েছে। সদানন্দ সুর যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন তার উদ্ধার নেই, সদানন্দ সুর তাকে শোষণ করবে। সে ঠিক করল সদানন্দ সুরকে সরাতে হবে। তার মাথায় বুদ্ধি আছে, হাতে আছে মারাত্মক অস্ত্র। সদানন্দকে সরানো শক্ত কাজ নয়।

সদানন্দ ভগিনীপতির বাসায় তোরঙ্গ রেখে কলকাতায় গিয়ে বোধকরি ফুর্তিই করছেন, এদিকে বিশু মল্লিক একদিন সন্ধ্যের পর ঘোড়ায় চড়ে জঙ্গলে ঢুকল, শিমুলগাছ থেকে একটি হ্যাণ্ড-গ্রিনেড নিয়ে সদানন্দর বাড়িতে বুবি-ট্র্যাপ পেতে এল। সদানন্দ কলকাতা থেকে ফিরে যেই বাড়িতে ঢুকতে যাবেন অমনি বোমা ফাটবে।

কিন্তু সদানন্দ সুর কলকাতা থেকে ফিরে আসবার আগেই কিছু কিছু ব্যাপার ঘটতে আরম্ভ করেছিল। বিশু মল্লিকের যখনই অস্ত্র-শস্ত্র বিক্রি করবার দরকার হ'ত তখনই সে ঘোড়ায় চড়ে জঙ্গলে যেত। একদিন রাত্রি দশটার সময় অমৃত বাছুর খুঁজতে এসে ঘোড়াটাকে দেখে ফেলল। সে ভাবল ঘোড়া-ভূত। তারপর যখন সে বন্ধুদের খোঁচায় আবার জঙ্গলে ঢুকল তখন শুধু ঘোড়া নয়, শিমুলতলায় ঘোড়ার সওয়ারের সঙ্গেও তার দেখা হয়ে গেল।

বিশু মল্লিক সেদিন বোধহয় সদানন্দ সুরের বাড়িতে বুবি-ট্র্যাপ পেতে ফিরে যাচ্ছিল। দুজনেই দুজনকে চেনে; অমৃত চাকরির জন্যে বিশু মল্লিকের কাছে দরবার করছিল। বিশু মল্লিক দেখল, এর পর যখন বুবি-ট্র্যাপ ফাটবে তখন অমৃত সাক্ষী দেবে যে, সে বিশু মল্লিককে রাত্তিরে সদানন্দ সুরের বাড়ির পিছনে দেখেছে; হয়তো বিশু মল্লিক যখন সদানন্দ সুরের পাঁচিল টপ্‌কে বেরুচ্ছিল তখন দেখেছে। অতএব অমৃতের বেঁচে থাকা নিরাপদ নয়। বিশু মল্লিকের কাছে অটোম্যাটিক পিস্তল ছিল, সে অমৃতকে খুন করে ঘোড়ার পিঠে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি যখন প্রথম ওকুস্থলে এসে তদন্ত আরম্ভ করলাম তখন সবচেয়ে আশ্চর্য মনে হ'ল—ঘোড়া। অমৃত ঘোড়া-ভূত দেখেছিল, আমি দেখলাম জলজ্যান্ত ঘোড়ার খুরের দাগ। একটা ঘোড়া এই মামলার সঙ্গে জড়িত আছে। তখনও আমরা আসামীকে চিনি না, কিন্তু সে যেই হোক, ঘোড়ায় চড়ে জঙ্গলে আসে। কেন?

ঘোড়ায় চড়ে শীগ্‌গির যাতায়াত করা যায়, কিন্তু আবার সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যে-লোক দুষ্কার্য করতে বেরিয়েছে সে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায় না; তবে এ-ব্যক্তি ঘোড়ায় চড়ে জঙ্গলে আসে কেন? নিশ্চয় কোনও বিশেষ সুবিধে আছে। কী সুবিধে? সদানন্দ সুরের পাঁচিল টপ্‌কানো? ঘোড়ার পিঠ থেকে পাঁচিল টপ্‌কানোর সুবিধে হয়, ওদিকে নামবার জন্যে পেয়ারাগাছ আছে।

কিন্তু শুধু কি এই? না অন্য কিছুও আছে? এ প্রশ্নের উত্তর পেয়েছিলাম কাল রাত্রে। কিন্তু সে পরের কথা।

যথাসময়ে সদানন্দ সুর ফিরে এলেন। তোরঙ্গটা তিনি ফিরিয়ে আনেননি, বোধহয় ইচ্ছে ছিল বাড়িতে দু'দিন বিশ্রাম করে ভগিনী-পতির বাসা থেকে তোরঙ্গ নিয়ে আসবেন। কিন্তু তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হ'ল না। নিজের বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে প্রায় আমাদের চোখের সামনে তিনি মারা গেলেন।

সদানন্দ সুরের মৃত্যুর পর কিছুই বুঝতে বাকি রইল না। আমি যাকে ধরতে এসেছি সে-ই মেরেছে অমৃত আর সদানন্দ সুরকে। যারা আগ্নেয়াস্ত্র কেনে তারা বাইরের লোক, হত্যাকারী বাইরের লোক নয়; অমৃত আর সদানন্দ সুরের চেনা লোক। অমৃত তাকে দেখে ফেলেছিল এবং সদানন্দ সুর তাকে দোহন করতে শুরু করেছিল। কেবল দুটো কথা তখনও অজ্ঞাত ছিল—লোকটা কে? এবং কালো ঘোড়ায় চড়ে আসে কেন?

অমৃত বলেছিল, কালো ঘোড়া-ভূত, নাক দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে। সবটাই তার উত্তপ্ত কল্পনা হ'তে পারে। আবার খানিকটা সত্যি হ'তে পারে। সুতরাং কালো ঘোড়ার খোঁজ নেওয়া দরকার।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল সান্তালগোলায় কেবল একটি কালো ঘোড়া আছে, তার মালিক বদ্রিদাস মাড়োয়ারী। তবে কি বদ্রিদাস-ই আমার আসামী? বদ্রিদাস লোকটি পাঁকাল-মাছের মতো পিছল; তিনি ধান-চালে প্রচুর কাঁকর মেশাতে পারেন, স্বজাতির প্রতি তাঁর অসীম পক্ষপাত থাকতে পারে; কিন্তু তিনি দু-দুটো মানুষকে খুন করতে পারেন এত সাহস নেই। তা ছাড়া তাঁকে ঘোড়সওয়ার রূপে কল্পনা করা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

আমি বেনামী চিঠি পাঠানোর ফলে একটা কাজ হয়েছিল, সন্দেহভাজনদের দল থেকে জনকতক লোককে বাদ দেওয়া গিয়েছিল। যমুনাদাস গঙ্গারাম বেনামী চিঠি পুলিসকে দেখিয়েছিল,

সুতরাং সে নয়। নফর কুণ্ডুর ওপর প্রথমে সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু দেখা গেল তার ঘোড়া নেই। পরের ঘোড়া ধার করে কেউ খুন করতে যায় না। প্রাণকেষ্ট পালকে অবশ্য আমি গোড়া থেকেই বাদ দিয়েছিলাম। ট্রলিতে চড়ে বাঘমারি গ্রামের কাছাকাছি যাওয়া যায় বটে, কিন্তু ট্রলিতে কুলী থাকে, তাদের চোখ এড়িয়ে খুন করার সুবিধে নেই। আমার শুধু জানবার কৌতূহল ছিল, সদানন্দ সুরের ট্রাঙ্কে কী আছে।

যাহোক, সন্দেহভাজনের দলকে ছাঁটাই করে মাত্র তিনজন দাঁড়াল—বদ্রিদাস মাড়োয়ারী, বিশু মল্লিক আর সুখময় দারোগা। সুখময় দারোগাকে বাদ দিতে পারিনি ; তার একটা ঘোড়া আছে, যদিও সেটা কালো নয়। এবং তার পক্ষে এইজাতীয় কারবার চালানো যত সহজ এমন আর কারুর পক্ষে নয়। প্রদীপের নিচেই অন্ধকার বেশী।

অবশ্য যখন জানতে পারলাম বিশু মল্লিক একসময় জকি ছিল, তখন সব সন্দেহই তার ওপর গিয়ে পড়ল। উপরন্তু জানা গেল, বিশু মল্লিক সদানন্দ সুরকে পাঁচশো টাকা ধার দিয়েছে। আসলে ওটা ধার নয়—ঘুষ। সদানন্দ সুরের মতো নিঃস্ব লোককে কোনও ব্যবসাদার শুধু-হাতে ধার দেবে না।

আমি বিশু মল্লিকের জন্যে টোপ ফেললাম, আমার মনের প্রাণের কথা সব তাকে বলে ফেললাম। জঙ্গলে যে অস্ত্রগুলো লুকিয়ে রাখা সম্ভব এ-চিন্তা আমার গোড়া থেকেই ছিল। আমি ভেবেছিলাম শিমুলগাছের কাছাকাছি কোথাও মাটিতে পোঁতা আছে। বিশু মল্লিক যখন শুনল আমরা জঙ্গল খানাতল্লাশ করবার মতলব করেছি তখন সে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল। অস্ত্রগুলো অবশ্য খুবই যত্ন করে লুকিয়ে রাখা হয়েছে ; কিন্তু বলা যায় না, পুলিস খুঁজে বার করতে পারে। তখন বিশু মল্লিককে অবশ্য ধরা যাবে না, কিন্তু অনেক টাকার মাল বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। বিশু মল্লিক লোভে পড়ে গেল।

কাল বিকেলে আমি যখন রামডিহি যাবার জন্যে ট্রেনে চড়লাম তখন বিশু মল্লিক এসে দেখে গেল আমি সত্যি যাচ্ছি কিনা। আমার অবশ্য রামডিহি পর্যন্ত যাবার প্ল্যান ছিল না, স্থির করেছিলাম পরের স্টেশনে নেমে বাঘমারিতে ফিরে আসব। কিন্তু দৈব অনুকূল, ঠিক বাঘমারি গ্রামের গায়ে ট্রেন থেমে গেল।

গ্রামে গিয়ে পটল, দাশু আর গোপালকে যোগাড় করলাম; তাদের নিয়ে জঙ্গলে গেলাম। সারা জঙ্গল তল্লাশ করা অসম্ভব; কিন্তু সদানন্দ সুরের পাঁচিলের পাশে যেখানে ঘোড়ার খুরের দাগ পাওয়া গিয়েছিল সেখান থেকে শিমুলগাছের গোড়া পর্যন্ত খুঁজে দেখলাম, যদি কোথাও সদ্য-খোঁড়া মাটি দেখতে পাই। কিন্তু সে-রকম কিছুই চোখে পড়ল না।

এখন কি করা যায়! সূর্যাস্তের বেশী দেরি নেই। জঙ্গলে বসে সিগারেট টানতে টানতে মতলব ঠিক করে নিলাম। পটলদের বললাম,—'চলো, সান্তালগোলার দিকে যাওয়া যাক।'

জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সান্তালগোলার কিনারায় পৌঁছলাম। এখানে জঙ্গল প্রায় দেড়শো গজ চওড়া; এক প্রান্তে স্টেশন, অন্য-প্রান্তে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, মাঝামাঝি বিশু মল্লিকের মিল্। মিল্-এর এটা পিছন দিক, কাঁটা-তারের বেড়ায় ছোট খিড়কির ফটক আছে। আমি পটলদের আমার প্ল্যান বুঝিয়ে দিলাম। তারা জঙ্গলের কিনারায় সম-ব্যবধানে গাছে উঠে লুকিয়ে থাকবে এবং লক্ষ্য করবে ঘোড়ায় চড়ে কিম্বা পায়ে হেঁটে কেউ জঙ্গলে ঢোকে কিনা। লোকটাকে চেনবার চেষ্টা করবে, কিন্তু কোনও অবস্থাতেই ধরবার চেষ্টা করবে না।

পটল উঠল বিশু মল্লিকের মিল্-এর সরাসরি একটা গাছে, দাশু গেল স্টেশনের দিকে আর গোপাল ব্যাঙ্কের দিকে। আকাশে আজও চাঁদ আছে; রাত হলেও, এদের চোখ এড়িয়ে কেউ জঙ্গলে ঢুকতে পারবে না।

ওদের গাছে তুলে দিয়ে আমি ফিরে চললাম শিমুলগাছের

কাছে। ওই গাছটা আমার মনে ঘোর সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছিল। অমৃতের মৃত্যু হয় ওই গাছের তলায়। এ-রহস্যের চাবিকাঠি যদি এই জঙ্গলের মধ্যে থাকে তবে নিশ্চয় ঐ শিমুলগাছের কাছাকাছি কোথাও আছে।

যখন শিমুলতলায় ফিরে এলাম তখন সন্ধ্যে পেরিয়ে গেছে, চাঁদের আলো ফুটেছে। শিমুলগাছ থেকে বিশ-পঁচিশ হাত দূরে একটা ঝাকড়া গোছের গাছ ছিল, আমি তাতে উঠে পড়লাম। এইখানে বসে বাঘ-শিকারীর মতো অপেক্ষা করব। আমার সঙ্গে অস্ত্র নেই, আমি এসেছি শুধু ব্যাঘ্র-মশাইকে দেখতে। তিনি আসবেন কিনা জানি না, কিন্তু যদি আসেন, ন'টার আগেই আসবেন।

শিমুলগাছের সব পাতাই প্রায় ঝরে গেছে, গাছের তলায় ছায়া নেই! চাঁদ যত উঁচুতে উঠছে আলো তত পরিষ্কার হচ্ছে। হঠাৎ কাছের একটা গাছ থেকে কোকিল ডেকে উঠল। বিচিত্র পরিস্থিতি। আমি বসে আছি একটা নৃশংস নরহন্তাকে দেখব ব'লে, আর— কোকিল ডাকছে! আজব দুনিয়া!

বেশ খানিকক্ষণ কেটে গেল। চোখের কাছে হাত এনে ঘড়ি দেখলাম, পৌনে আটটা। সঙ্গে সঙ্গে দূর থেকে একটা আওয়াজ কানে এল, শুক্‌নো পাতার ওপর পায়ের মচমচ শব্দ। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, ঘন ছায়ার ভিতর থেকে ধীরমন্থর গমনে একটা ঘোড়া বেরিয়ে আসছে। কালো ঘোড়া। তার পিঠে বসে আছে কালো-পোশাক-পরা একটা মানুষ। মানুষটার মুখ দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু সে জকির মতো সামনে ঝুঁকে বসেছে আর সতর্কভাবে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।

ঘোড়াটা সোজা গিয়ে শিমুলগাছের বিরাট গুঁড়ির গা ঘেঁষে দাঁড়াল, পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল। তারপর যা দেখলাম তা একেবারে সার্কাসের খেলা। ঘোড়ার সওয়ার টপ্‌ করে ঘোড়ার

পিঠে উঠে দাঁড়াল। তারপর হাত বাড়িয়ে শিমুলগাছের গুঁড়িতে একটা ফোকরের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলে। মাটি থেকে দশ হাত উঁচুতে যেখানে ডালপালা বেরিয়েছে সেখানে একটা খোপের মতো ফুটো আছে। অচিন পাখীর বাসা!

ঘোড়ার পিঠে আসামী কেন জঙ্গলে আসে এখন বুঝতে পারছ? অস্ত্রগুলো মাটিতে পোঁতা নেই, আছে গাছের ফোকরের মধ্যে, মাটি থেকে দশ হাত উঁচুতে। শিমুলগাছের গায়ে শক্ত-শক্ত মোটা-মোটা কাঁটা থাকে; শিমুলগাছে মানুষ ওঠে না, এমনকি কাঠবেড়ালি পর্যন্ত ওঠে না। এমন নিরাপদ গুপ্তস্থান আর নেই। অবশ্য মই লাগিয়ে ওঠা যায়। কিন্তু কে মই লাগাবে? যারা গুপ্তস্থানের সন্ধান জানে না তারা কিজন্যে মই লাগাবে? আর যিনি জানেন তিনি যদি মই ঘাড়ে করে জঙ্গলে আসেন তাহলে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। তার চেয়ে ঘোড়া ঢের নিরাপদ; বিশেষত যদি জকির হাতের শিক্ষিত ঘোড়া হয়।

যাহোক, ঘোড়সওয়ারের বাঁ-হাতে একটা থলি আছে; সে খোপের মধ্যে ডান হাত ঢুকিয়ে একটি একটি করে অস্ত্রগুলি বার করছে আর থলিতে রাখছে। এতক্ষণে ঘোড়সওয়ারকে চিনতে পেরেছি—বিশু মল্লিক। মুখ চিনতে না পারলেও, ঐ রোগা বেঁটে শরীর আর ধনুকের মতো বাঁকা ঠ্যাং ভুল হবার নয়। আমি ঠিকই আন্দাজ করেছিলাম। কিন্তু একটা ধোঁকা তখনও কাটেনি; বিশু মল্লিক কালো ঘোড়া পেল কোত্থেকে? সে ভারি হুঁশিয়ার লোক, তার যদি কালো ঘোড়া থাকত সে কখনই আমার কাছে মিথ্যেকথা বলত না। আসলে আমি যখন তাকে কালো ঘোড়া সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলাম তখন সে আমার প্রশ্নের তাৎপর্য বুঝতে পারেনি। এ-মামলার সঙ্গে কালো ঘোড়ার যে কোনও সম্বন্ধ আছে তা সে কল্পনা করতেই পারেনি। আমি কালো ঘোড়ার রহস্য বুঝলাম কাল দুপুর-রাত্রে, বাসায় ফিরে এসে।

সে যাক, বিশু মল্লিক থলি ভরে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে নেমে বসল, তারপর মন্দমন্থর চালে ফিরে চলল। সে জঙ্গলের ছায়ায় অদৃশ্য হয়ে যাবার পর আমি গাছ থেকে নামলাম। ঘড়িতে তখন সওয়া আটটা। আমি আবার পটলদের উদ্দেশ্যে ফিরে চললাম। আমার প্ল্যান ঠিকই ফলেছে; পুলিস কাল জঙ্গল তল্লাশ করবে, তাই আজ বিশু মল্লিক অস্ত্রগুলো জঙ্গল থেকে সরিয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে অস্ত্রগুলোকে সে রাখবে কোথায়? কারণ, কেবল মানুষটাকে ধরলে চলবে না, অস্ত্রগুলোও চাই। বস্তুত, অস্ত্রগুলো না পেলে মানুষটাকে ধরে কোনও লাভ নেই।

আমি যখন জঙ্গলের কিনারায় পৌঁছলাম তখনও পটলেরা গাছ থেকে নামেনি, আমাকে দেখে নেমে এল। তিনজনেই ভীষণ উত্তেজিত; তারা ঘোড়সওয়ারকে জঙ্গলে ঢুকতে দেখেছে এবং চিনতে পেরেছে। বিশু মল্লিক তার রাইস্ মিল্-এর খিড়কি-ফটক দিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বেরিয়ে এল, পটলের গাছের প্রায় পাশ দিয়ে জঙ্গলে ঢুকল। চল্লিশ মিনিট পরে আবার ফিরে নিজের ফটক দিয়ে মিল্-এ চলে গেল।

আমি জিগ্যেস করলাম,—'ঠিক দেখেছ নিজের ফটকে ঢুকেছে? অন্য কোথাও যায়নি?'

পটল বলিল,—'আজ্ঞে না, অন্য কোথাও যায়নি।'

আমি নিশ্চিন্ত হলাম। অস্ত্রগুলো বিশু মল্লিক মিল্-এই রাখবে, অন্তত যতদিন না পুলিস জঙ্গল-তল্লাশ শেষ করে। আমি সকালবেলা তাকে বলেছিলাম মিল্ খানাতল্লাশ করব না, আমার কথায় সে বিশ্বাস করেছে। আমাকে বিশু মল্লিক বোধহয় খুবই সরলপ্রকৃতির লোক বলে মনে করেছিল।

আমি তখন পটল, দাশু আর গোপালের পিঠ ঠুকে দিয়ে বললাম,—'তোমাদের জন্যেই অমৃতের মৃত্যুর কিনারা করতে পারলাম। কিন্তু আজ আর বেশী কৌতূহল প্রকাশ কোরো না;

কাল সকাল ন'টার সময় এসো, তখন সব জানতে পারবে। কিন্তু সাবধান, কাউকে একটি কথা বলবে না।'

তারা গ্রামে ফিরে গেল। আমি থানায় গেলাম। সুখময় দারোগার কাছে পিস্তলটা যোগাড় করে স্টেশনে গেলাম। স্টেশন থেকে কাজকর্ম সেরে যখন ফিরে এলাম তখন রাত দুপুর, তুমি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছ।

তোমাকে জাগালাম না, পিছনের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখি, জানালার বাইরে কয়েকটা জন্তু বসে আছে। প্রথমটা আমিও ভেবেছিলাম কালো কুকুর, তারপর লক্ষ্য করে দেখলাম, কুকুর নয়—শেয়াল। ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গে কালো-ঘোড়ার রহস্য ভেদ হয়ে গেল। বুঝতে পারলে না? অত্যন্ত সহজ, এমন কি, হাস্যকর। কেন যে কথাটা মাথায় আসেনি জানি না।—শেয়ালের গায়ের রং কালো নয়, পাট্‌কিলে। অথচ আমরা দেখলাম কালো। ঘোড়াটাও কালো ছিল না, ছিল গাঢ় বাদামী রঙের; ইংরেজিতে যাকে বলে চেস্ট্‌নাট। চাঁদের আলোয় সব গাঢ়রঙই দূর থেকে কালো দেখায়। তাই অমৃত কালো ঘোড়া-ভূত দেখেছিল, আমিও কালো-ঘোড়া দেখেছিলাম। এই হ'ল কালো-ঘোড়ার রহস্য। রহস্য না বলে যদি পরিহাস বলতে চাও তাতেও আপত্তি নেই।

রাত্রে খেতে বসে তুমি সস্ত্রীক প্রাণকেষ্ট পালের উপাখ্যান বললে। ওদের গলদ কোথায় বুঝতে বেশী কষ্ট হয় না। প্রাণকেষ্ট পাল নিজের কাজে বেশ দক্ষ, কিন্তু ঘরে জারিজুরি চলে না, স্ত্রীর কাছে কেঁচো। সদানন্দ সুর বোনের কাছে তোরঙ্গ রেখে গিয়েছিলেন ঠিকই। তোরঙ্গ গোড়ায় ভাঙা হয়নি; কিন্তু যখন তাঁর মৃত্যুসংবাদ এল তখন ভগিনী সুশীলা আর দ্বিধা করলেন না, তোরঙ্গের তালা ভাঙলেন এবং যা পেলেন আত্মসাৎ করলেন। হয়তো দাদার বিষয়-সম্পত্তি সবই তিনি শেষ পর্যন্ত পাবেন, কিন্তু আইনের কথা কিছু বলা যায় না। হাতে যা পাওয়া গেছে তা হজম করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

এই হচ্ছে ভগিনী সুশীলার মনস্তত্ত্ব। প্রাণকেষ্ট পাল কিন্তু পুরুষমানুষ, হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞান আছে ; তাই তোমাকে দেখে তিনি বেজায় নার্ভাস হয়ে পড়েছিলেন।—

তারপর আর কি ? এবার বেদব্যাসের বিশ্রাম। এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে বিশু মল্লিকের মতো আরও কত মহাজন নীরবে তপস্যা করছেন কে তার খবর রাখে !

ব্যোমকেশ প্রকাণ্ড হাই তুলিয়া পাশ ফিরিল ; বলিল,—'জাগি পোহাল বিভাবরী। এইবেলা একটু ঘুমিয়ে নাও, আজ রাত্রেই কলকাতা ফিরব। হে হে।'

শৈল রহস্য

সহ্যাদ্রি হোটেল
মহাবলেশ্বর—পুণা
৩রা জানুআরি

ভাই অজিত,

বোম্বাই এসে অবধি তোমাদের চিঠি দিতে পারিনি। আমার পক্ষে চিঠি লেখা কি রকম কষ্টকর কাজ তা তোমরা জানো। বাঙালীর ছেলে চিঠি লিখতে শেখে বিয়ের পর। কিন্তু আমি বিয়ের পর দু'দিনের জন্যেও বৌ ছেড়ে রইলাম না, চিঠি লিখতে শিখব কোত্থেকে? তুমি সাহিত্যিক মানুষ, বিয়ে না করেও লম্বা চিঠি লিখতে পার। কিন্তু তোমার কল্পনা-শক্তি আমি কোথায় পাব ভাই। কাঠখোট্টা মানুষ, স্রেফ সত্য নিয়ে কারবার করি।

তবু আজ তোমাকে এই লম্বা চিঠি লিখতে বসেছি। কেন লিখতে বসেছি তা চিঠি শেষ পর্যন্ত পড়লেই বুঝতে পারবে। মহাবলেশ্বর নামক শৈলপুরীর সহ্যাদ্রি হোটেলে রাত্রি দশটার পর মোমবাতি জ্বেলে এই চিঠি লিখছি। বাইরে শীতজর্জর অন্ধকার; আমি ঘরের দোর জানালা বন্ধ করে লিখছি, তবু শীত আর অন্ধকারকে ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। মোমবাতির শিখাটি থেকে থেকে নড়ে উঠছে; দেয়ালের গায়ে নিঃশব্দ ছায়া পা টিপে টিপে আনাগোনা করছে। ভৌতিক পরিবেশ। আমি অতিপ্রাকৃতকে সারা জীবন দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছি, কিন্তু—

অনেক দিন আগে একবার মুঙ্গেরে গিয়ে বরদাবাবু নামক একটি ভূতজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল মনে আছে? আমি তাঁকে বলেছিলাম—ভূত প্রেত থাকে থাক, আমি তাদের হিসেবের বাইরে

রাখতে চাই। এখানে এসে কিন্তু মুশকিলে পড়ে গেছি, ওদের আর হিসেবের বাইরে রাখা যাচ্ছে না।

কিন্তু থাক। গল্প বলার আর্ট জানা নেই বলেই বোধহয় পরের কথা আগে বলে ফেললাম। এবার গোড়া থেকে শুরু করি।—

যে-কাজে বোম্বাই এসেছিলাম সে কাজটা শেষ করতে দিন চারেক লাগল। ভেবেছিলাম কাজ সেরেই ফিরব, কিন্তু ফেরা হল না। কর্ম্মসূত্রে একজন উচ্চ পুলিস কর্মচারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, মারাঠী ভদ্রলোক, নাম বিষ্ণু বিনায়ক আপ্টে। তিনি বললেন, 'বম্বে এসেছেন, পুণা না দেখেই ফিরে যাবেন?'

প্রশ্ন করলাম,—'পুণায় দেখবার কী আছে?'

তিনি বললেন,—'পুণা শিবাজী মহারাজের পীঠস্থান, সেখানে দেখবার জিনিসের অভাব? সিংহগড়, শনিবার দুর্গ, ভবানী মন্দির—'

ভাবলাম এদিকে আর কখনও আসব কি না কে জানে, এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। বললাম,—'বেশ যাব।'

আপ্টের মোটরে চড়ে বেরুলাম। বোম্বাই থেকে পুণা যাবার পাকা মোটর-রাস্তা আছে, সহ্যাদ্রির গিরিসঙ্কটের ভিতর দিয়ে পাক খেয়ে খেয়ে গিয়েছে। এখানকার নৈসর্গিক বর্ণনা করা আমার কর্ম নয়। এক পাশে উত্তুঙ্গ শিখর, অন্য পাশে অতলস্পর্শ খাদের কোলে সবুজ উপত্যকা। তুমি যদি দেখতে একটা চম্পূকাব্য লিখে ফেলতে।

পুণায় আপ্টের বাড়িতে উঠলাম। সাহেবী কাণ্ডকারখানা, আদর যত্নের সীমা নেই। আমাকে আপ্টে যে এত খাতির করছেন তার পিছনে আপ্টের স্বাভাবিক সহৃদয়তা তো আছেই, বোধহয় বোম্বাই প্রাদেশিক সরকারের ইশারাও আছে। সে যাক। পুণায় বোম্বাই-এর চেয়ে ঢের বেশি ঠাণ্ডা; কারণ বোম্বাই শহর সমুদ্রের সমতলে, আর পুণা সমুদ্র থেকে প্রায় দু'হাজার ফুট উঁচুতে। পুণার

ঠাণ্ডায় কিন্তু বেশ একটি চনমনে ভাব আছে ; শরীর-মনকে চাঙ্গা করে তোলে, জড়ভরত করে ফেলে না।

পুণায় তিন দিন থেকে দর্শনীয় যা-কিছু আছে সব দেখলাম। তারপর আপ্টে বললেন,—'পুণায় এসে মহাবলেশ্বর না দেখে চলে যাবেন ?'

আমি বললাম,—'মহাবলেশ্বর ! সে কাকে বলে ?'

আপ্টে হেসে বললেন,—'একটা জায়গার নাম। বম্বে প্রদেশের সেরা হিল-স্টেশন। আপনাদের যেমন দার্জিলিং আমাদের তেমনি মহাবলেশ্বর। পুণা থেকে আরও দু'হাজার ফুট উঁচু। গরমের সময় বম্বের সবাই মহাবলেশ্বরে যায়।'

'কিন্তু শীতকালে তো যায় না। এখন ঠাণ্ডা কেমন ?'

'একেবারে হোম ওয়েদার। চলুন চলুন, মজা পাবেন।'

অতএব মহাবলেশ্বর এসেছি এবং বেশ মজা টের পাচ্ছি।

পুণা থেকে মহাবলেশ্বর বাহাত্তর মাইল ; মোটরে আসতে হয়। আমরা পুণা থেকে বেরুলাম দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর, মহা-বলেশ্বরে পৌঁছুলাম আন্দাজ চারটের সময়। পৌঁছে দেখি শহর শূন্য, দু'চারজন স্থায়ী বাসিন্দা ছাড়া সবাই পালিয়েছে। সত্যিই হোম ওয়েদার ; দিনের বেলায় হি হি কম্প, রাত্রে হি হি কম্প। ভাগ্যিস আপ্টে আমার জন্যে একটা মোটা ওভারকোট এনেছিলেন, নৈলে শীত ভাঙতো না।

শহরের বর্ণনা দেব না, মনে কর দার্জিলিঙের ছোট ভাই। আপ্টে আমাকে নিয়ে সহ্যাদ্রি হোটেলে উঠলেন। হোটেলে একটিও অতিথি নেই, কেবল হোটেলের মালিক দু'তিন জন চাকর নিয়ে বাস করছেন।

হোটেলের মালিক জাতে পার্সী, নাম সোরাব হোমজি। আপ্টের পুরনো বন্ধু। মধ্যবয়স্ক লোক, মোটাসোটা, টকটকে রঙ। বিষয়-বুদ্ধি নিশ্চয় আছে, নৈলে হোটেল চালানো যায় না ; কিন্তু ভারি

অমায়িক প্রকৃতি। আপ্টে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন; তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে একবার তাকিয়ে খুব সমাদর করে নিজের বসবার ঘরে নিয়ে গেলেন। অবিলম্বে কফি এসে পড়ল, তার সঙ্গে নানারকম প্যাস্ট্রি। ভাল কথা, তুমি বোধ হয় জান না, গোঁড়া পার্সীরা ধূমপান করে না, কিন্তু মদ খায়। মদ না খেলে তাদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত লাগে।

কফি-পর্ব শেষ না হতে হতে সূর্যাস্ত হয়ে গেল। অতঃপর আপ্টে আমাকে হোটেলে রেখে মোটর নিয়ে বেরুলেন; এখানে তাঁর কে একজন আত্মীয় আছে তার সঙ্গে দেখা করে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরবেন। তিনি চলে যাবার পর হোমজি মৃদু হেসে বললেন,—'আপনি বাঙালী। শুনে আশ্চর্য হবেন, মাস দেড়েক আগে পর্যন্ত এই হোটেলের মালিক ছিলেন একজন বাঙালী।'

আশ্চর্য হলাম। বললাম,—'বলেন কি! বাঙালী এতদূরে এসে হোটেল খুলে বসেছিল!'

হোমজি বললেন,—'হ্যাঁ। তবে একলা নয়। তাঁর একজন গুজরাতী অংশীদার ছিল।'

এই সময় একটা চাকর এসে অবোধ্য ভাষায় তাঁকে কি বলল, তিনি আমাকে জিগ্যেস করলেন,—'আপনি কি স্নান করবেন? যদি করেন, গরম জল তৈরি আছে।'

বললাম,—রক্ষে করুন, এই শীতে স্নান! একেবারে বোম্বাই গিয়ে স্নান করব।'

চাকর চলে গেল। তখন আমি হোমজিকে প্রশ্ন করলাম, —'আচ্ছা, আপনি তো বম্বের লোক? তাহলে এই শীতে এখানে রয়েছেন কেন? এখানে তো কাজকর্ম এখন কিছু নেই।'

হোমজি বললেন,—কাজকর্ম আছে বৈকি। মার্চ মাস থেকে হোটেল খুলবে, অতিথিরা আসতে শুধু করবে। তার আগেই বাড়িটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে ফিট্‌ফাট করে তুলতে হবে। তাছাড়া

বাড়ির পিছনদিকে গোলাপের বাগান করেছি। চলুন না দেখবেন। এখনও দিনের আলো আছে।'

বাড়ির পিছন দিকে গিয়ে বাগান দেখলাম। বাগান এখনও তৈরি হয়নি, তবে মাসখানেকের মধ্যে ফুল ফুটতে আরম্ভ করবে। হোমজির ভারি বাগানের শখ।

এইখানে সহ্যাদ্রি হোটেলের একটা বর্ণনা দিয়ে রাখি। চুনকাম করা পাথরের দোতলা বাড়ি, সবস্দ্ধ বারো-চৌদ্দটা বড় বড় ঘর আছে। সামনে দিয়ে গেরু-মাটি ঢাকা রাস্তা গিয়েছে ; পিছন দিকে গোলাপ বাগানের জমি, লম্বায় চওড়ায় কাঠা চারেক হবে। তারপরই গভীর খাদ ; শুধু গভীর নয়, খাড়া নেমে গিয়েছে। পাথরের মোটা আলসের উপর ঝুঁকে উঁকি মারলে দেখা যায়, অনেক নিচে ঘন ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে একটা সরু ঝরনার ধারা বয়ে গেছে।

আমরা বাগান দেখে ফিরছি এমন সময় খাদের নিচে থেকে একটা গভীর আওয়াজ উঠে এল। অনেকটা মোষের ডাকের মত। নিচে তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার, ওপরে একটু আলো আছে ; আমি জিগ্যেস করলাম,—'ও কিসের আওয়াজ !'

হোমজি বললেন,—'বাঘের ডাক। আসুন, ভেতরে যাওয়া যাক।'

ঘরে বিদ্যুৎবাতি জ্বলছে ; চাকর একটা গন্‌গনে কয়লার আংটা মেঝের উপর রেখে গেছে। আমরা আংটার কাছে চেয়ার টেনে বসলাম। ঠাণ্ডা আঙুলগুলোকে আগুনের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে বললাম,—'এদিকে বড় বাঘ আছে ?'

হোমজি বললেন,—'আছে। তাছাড়া চিতা আছে, হায়েনা আছে, নেকড়ে আছে। যে বাঘটার ডাক আজ শুনলেন সেটা মানুষের রক্তের স্বাদ পেয়েছে কিনা, তাই এ তল্লাট ছেড়ে যেতে পারছে না।'

'মানুষখেকো বাঘ ! কত মানুষ খেয়েছে ?'

'আমি একটার কথাই জানি। ভারি লোমহর্ষণ কাণ্ড! শুনবেন?'

এই সময় আপ্টে ফিরে এলেন, লোমহর্ষণ কাণ্ড চাপা পড়ে গেল। আপ্টে বললেন, তাঁর আত্মীয় ছাড়ছেন না, আজ রাত্রে তাঁকে সেখানেই ভোজন এবং শয়ন করতে হবে। কিছুক্ষণ গল্পসল্প করে তিনি উঠলেন, আমাকে বললেন,—'কাল সকাল ন'টার মধ্যে আমি আসব। আপনি ব্রেক্‌ফাস্ট খেয়ে তৈরি হয়ে থাকবেন, দু'জনে বেরুব। এখানে অনেক দেখবার জায়গা আছে; বম্বে পয়েন্ট, আথার্স সীট, প্রতাপগড় দুর্গ—'

তিনি চলে গেলেন। আমরা আরও খানিকক্ষণ বসে এটা-সেটা গল্প করলাম। এখানে এখন শাকসব্জী-দুধ-ডিম-মুর্গী খুব সস্তা, আবার গরমের সময় দাম চড়বে।

কথায় কথায় হোমজি বললেন,—'আপনার ভূতের ভয় নেই তো?'

আমি হেসে উঠলাম। তিনি বললেন,—'কারুর কারুর থাকে। একলা ঘরে ঘুমোতে পারে না। তাহলে আপনার শোবার ব্যবস্থা যদি দোতলায় করি আপনার অসুবিধা হবে না?'

বললাম,—'বিন্দুমাত্র না। আপনি কোথায় শোন?'

তিনি বললেন, 'আমি নিচেয় শুই। আমার বসবার ঘরের পাশে শোবার ঘর। আপনাকে ওপরে দিচ্ছি তার কারণ, এখন সব ঘরের বিছানাপত্র তুলে গুদামে রাখা হয়েছে। অতিথি তো নেই। কেবল দোতলার একটা ঘর সাজানো আছে। তাতে হোটেলের ভূতপূর্ব মালিক সস্ত্রীক থাকতেন। ঘরটা যেমন ছিল তেমনি আছে।'

বললাম,—'বেশ তো, সেই ঘরেই শোব।'

হোমজি চাকরকে ডেকে হুকুম দিলেন, চাকর চলে গেল। তার-পর আটটা বাজলে আমরা খেতে বসলাম। এরি মধ্যে মনে হল যেন কত রাত হয়ে গেছে, চারিদিক নিশুতি। বাড়িতে যদি ডাকাত

পড়ে, মা বলতেও নেই, বাপ বলতেও নেই। গল্প শোনার এই উপযুক্ত সময়। বললাম,—'আপনার লোমহর্ষণ কাণ্ড কৈ বললেন না?'

হোমজি বললেন,—'হ্যাঁ হ্যাঁ, ভারি রোমাঞ্চকর ব্যাপার। এই বাড়িতেই ঘটেছিল আগেকার তুই মালিকের মধ্যে। বলি শুনুন।'

হোমজি বলতে আরম্ভ করলেন। খাওয়া এবং গল্প একসঙ্গে চলতে লাগল। হোমজি বেশ রসিয়ে রসিয়ে গল্প বলতে পারেন, তাড়াহুড়ো নেই। তাঁর মাতৃভাষা অবশ্য গুজরাতি, কিন্তু ইংরেজীতেই বরাবর কথাবার্তা চলছিল। গল্পটাও ইংরেজীতেই বললেন। আমি তোমার জন্যে বাংলায় সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করে দিলাম।—

বছর ছয়েক আগে মানেকভাই মেহতা নামে একজন গুজরাতি আর বিজয় বিশ্বাস নামে একজন বাঙালী মহাবলেশ্বরে এই সহ্যাদ্রি হোটেল খুলেছিল। তু'জনে সমান অংশীদার; মেহতার টাকা আর বিজয় বিশ্বাসের মেহনত। এই নিয়ে হোটেল আরম্ভ হয়।

মানেক মেহতার অনেক কাজ-কারবার, সে মহাবলেশ্বরে থাকত না; তবে মাঝে মাঝে আসত। বিজয় বিশ্বাসই হোটেলের সর্বেসর্বা ছিলেন। কিন্তু আসলে হোটেলের দেখাশোনা করতেন বিজয় বিশ্বাসের স্ত্রী হৈমবতী। বিজয় বিশ্বাস কেবল ঘরে বসে সিগারেট টানতেন আর হিসেব-নিকেশ করতেন।

মানেক মেহতা লোকটা ছিল প্রচণ্ড পাজি। অবশ্য তখন তার সম্বন্ধে কেউ কিছু জানত না, তাকে ভাল করে কেউ চোখে দেখেনি। পরে সব জানা গেল। তার তিনটে বৌ ছিল, একটা গোয়ায়, একটা বম্বেতে, আর একটা আমেদাবাদে। এই তিন জায়গায় বেশির ভাগ সময় সে থাকত। যত রকম বে-আইনী তুষ্কার্য করাই ছিল তার পেশা। বোম্বাই প্রদেশে মদ্যপান নিষিদ্ধ, লোকটি বুট্‌লেগিং করত। বিদেশ থেকে লুকিয়ে সোনা আমদানি করত। অনেকবার তার মাল বাজেয়াপ্ত হয়েছে। কিন্তু লোকটাকে কেউ ধরতে পারেনি।

বিজয় বিশ্বাসের সঙ্গে মানেক মেহতার জোটপাট কি করে হল বলা যায় না। বিজয় বিশ্বাস লোকটা ও রকম ছিল না। যতদূর জানা যায়, বিজয় বিশ্বাস আগে থেকেই হোটেল চালানোর কাজ জানত ; হয়তো পুণায় কিংবা বোম্বাইএ কিংবা আমেদাবাদে ছোট-খাটো হোটেল চালাত। তারপর সে মানেক মেহতার নজরে পড়ে যায়। মানেক মেহতা যে ধরনের ব্যবসা করে তাতে কখনও হাতে অঢেল পয়সা, কখনও ভাঁড়ে মা ভবানী। সে বোধ হয় মতলব করেছিল হোটেল কিনে কিছু টাকা আলাদা করে রাখবে, যাতে সঙ্কটকালে হাতে একটা রেস্ত থাকে। বিজয় বিশ্বাস তার প্রকৃত চরিত্র জানতেন না, সরল মনেই তার অংশীদার হয়েছিলেন।

বিজয় বিশ্বাস আর তাঁর স্ত্রীর ম্যানেজমেণ্টে সহ্যাদ্রি হোটেল অল্পকালের মধ্যেই বেশ জাঁকিয়ে উঠল। মহাবলেশ্বরে হোটেলের মরসুম হচ্ছে আড়াই মাস, টেনেটুনে তিন মাস। কিন্তু এই কয় মাসের মধ্যেই হোটেলের আয় হয় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা ; খরচ-খরচা বাদ দিয়ে বিশ পঁচিশ হাজার টাকা লাভ থাকে ; মানেক মেহতা মরসুমের শেষে এসে কখনও নিজের ভাগের টাকা নিয়ে যেত, কখনও বা টাকা ব্যাঙ্কেই জমা থাকত।

সোরাব হোমজি প্রতি বছরই গরমের সময় মহাবলেশ্বরে আসতেন এবং সহ্যাদ্রি হোটেলে উঠতেন। হোটেলটি তাঁর খুব পছন্দ। মনে মনে ইচ্ছে ছিল এই রকম একটি হোটেল পেলে নিজে চালাবেন। তিনি পয়সাওয়ালা লোক, জীবিকার জন্যে কাজ করবার দরকার নেই। কিন্তু ব্যবসা করার প্রবৃত্তি পার্সীদের মজ্জাগত।

গত বছর মে মাসে হোমজি যথারীতি এসেছেন। পুরনো খদ্দের হিসেবে হোটেলে তাঁর খুব খাতির, স্বয়ং হৈমবতী তাঁর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের তত্ত্বাবধান করতেন। হোমজিও হৈমবতীর নিপুণ গৃহস্থালীর জন্যে তাঁকে খুব সম্মান করতেন। একদিন হৈমবতী বিমর্ষভাবে হোমজিকে

বললেন,—'শেঠজি, আসছে বছর আপনি যখন আসবেন তখন আমাদের আর দেখতে পাবেন না।'

হোমজি আশ্চর্য হয়ে বললেন,—'সে কি, দেখতে পাব না কেন?'

হৈমবতী বললেন,—'হোটেল বিক্রি করার কথা হচ্ছে। যিনি আমাদের পার্টনার তিনি হোটেল রাখবেন না। আমরাও চলে যাব। আমার স্বামীর এত ঠাণ্ডা সহ্য হচ্ছে না, আমরা দেশে ফিরে যাব।'

সেদিন সন্ধ্যেবেলা হোমজি হোটেলের অফিস-ঘরে গিয়ে বিজয় বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করলেন, বললেন,—'আপনারা নাকি হোটেল বিক্রি করছেন?'

বিজয় বিশ্বাসের বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ, স্ত্রীর চেয়ে অনেক বড়। একটু কাহিল গোছের চেহারা; আপাদমস্তক গরম জামা-কাপড় পরে, গলায় গলাবন্ধ জড়িয়ে বসে সিগারেট টানছিলেন, হোমজিকে খাতির করে বসালেন। বললেন,—'হ্যাঁ শেঠজি! আপনি কিনবেন?'

হোমজি বললেন,—'ভাল দর পেলে কিনতে পারি। আপনার পার্টনার কোথায়?'

বিশ্বাস বললেন,—'আমার পার্টনার এখন বিদেশে আছেন, তাই আমাকে আম-মোক্তারনামা দিয়েছেন। এই দেখুন।' তিনি দেরাজ থেকে পাওয়ার অফ্ অ্যাটর্নি বার করে দেখালেন।

তারপর দর-কষাকষি আরম্ভ হল; বিজয় বিশ্বাস হাঁকলেন দেড় লাখ, হোমজি বললেন, পঞ্চাশ হাজার। শেষ পর্যন্ত চুরাশি হাজারে রফা হল। কিন্তু স্থাবর সম্পত্তি কেনা তো দু'চার দিনের কাজ নয়; দলিল দস্তাবেজ তদারক করা, উকিল অ্যাটর্নির সঙ্গে পরামর্শ করা, রেজিস্ট্রি অফিসে খোঁজ খবর নেওয়া; এইসব করতে কয়েক মাস কেটে গেল। নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি হোমজি আর বিজয় বিশ্বাস পুণায় গেলেন; রেজিস্ট্রারের সামনে হোমজি

নগদ টাকা দিয়ে রেজিস্ট্রি করালেন। কথা হল, পয়লা ডিসেম্বর তিনি হোটেলের দখল নেবেন। তারপর হোমজি বোম্বাই গেলেন, বিজয় বিশ্বাস মহাবলেশ্বরে ফিরে এলেন।

হোটেলে তখন অতিথি নেই, একটা চাকরানী ছাড়া চাকর-বাকরও বিদেয় হয়েছে। তাই এরপর যেসব ঘটনা ঘটেছিল, তা কেবল হৈমবতীর জবানবন্দীর থেকেই জানা যায়। মানেক মেহতা নিশ্চয় নিজে আড়ালে থাকবার মতলব করেই বিজয় বিশ্বাসকে মোক্তার-নামা দিয়েছিল। যেদিন কবালা রেজিস্ট্রি হল, তার পরদিন রাত্রি ন'টার সময় সে সহ্যাদ্রি হোটেলে এসে হাজির। পরে পুলিসের তদন্তে জানা গিয়েছিল মানেক মেহতা মহাবলেশ্বরের বাইরে দু'মাইল দূরে মোটর রেখে পায়ে হেঁটে মহাবলেশ্বরে ঢুকেছিল।

সে যখন পৌঁছুল তখন বিজয় বিশ্বাস আর হৈমবতী রাত্রির খাওয়া-দাওয়া সেরে অফিস-ঘরে বসে নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করছিলেন। চাকরানীটা শুতে গিয়েছিল। তখন বেশ শীত পড়ে গেছে। মানেক মেহতার গায়ে মোটা ওভারকোট, মাথায় পশমের মঙ্কি-ক্যাপ। তার ব্যবহার বরাবরই খুব মিষ্টি। সে এসে বলল,—'হৈমাবেন, আমি আজ রাত্রে এখানেই থাকব, আর খাব। সামান্য কিছু হলেই চলবে।'

হৈমবতী খাবারের ব্যবস্থা করতে রান্নাঘরে চলে গেলেন, চাকরানীকে আর জাগালেন না। মানেক মেহতা আর বিজয় বিশ্বাস কাজকর্মের কথা শুরু করলেন। অফিস-ঘরে একটা মজবুত লোহার সিন্দুক ছিল; হোটেল বিক্রির টাকা এবং ব্যাঙ্কের জমা টাকা, সব এই সিন্দুকেই রাখা হয়েছিল। বিজয় বিশ্বাস জানতেন দু'এক দিনের মধ্যেই মেহতা টাকা নিতে আসবে।

হৈমবতী রান্নাঘরে গিয়ে স্টোভ জ্বেলে ভাজাভুজি তৈরি করতে লাগলেন, কিন্তু তাঁর কান পড়ে রইল অফিস-ঘরের দিকে। রান্নাঘর অফিস-ঘর থেকে বেশি দূর নয়, তার ওপর নিস্তব্ধ রাত্রি। কিছুক্ষণ

পরে তিনি শুনতে পেলেন, ওঁরা দু'জন অফিস-ঘর থেকে বেরিয়ে কথা বলতে বলতে হোটেলের পিছন দিকের জমিতে চলে গেলেন। হৈমবতীর একটু আশ্চর্য লাগল ; কারণ তাঁর স্বামী শীত-কাতুরে মানুষ, এত শীতে খোলা হাওয়ায় যাওয়া তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। কিন্তু হৈমবতীর মনে কোনও আশঙ্কাই ছিল না, তিনি রান্নাঘর থেকে বেরুলেন না, যেমন রান্না করছিলেন করতে লাগলেন।

তারপর হোটেলের পিছন দিক থেকে একটা চাপা চিৎকারের শব্দ শুনে তিনি একেবারে কাঠ হয়ে গেলেন। তাঁর স্বামীর গলার চিৎকার! ক্ষণকাল স্তম্ভিত অবস্থায় থেকে তিনি ছুটে গেলেন হোটেলের পিছন দিকে। পিছনের জমিতে যাবার একটা দরজা আছে, হৈমবতী দরজার কাছে পৌঁচেছেন এমন সময় মানেক মেহতা ওদিক থেকে ঝড়ের মত এসে ঢুকল। হৈমবতীকে সজোরে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে সদরের দিকে চলে গেল।

'কি হল! কি হল!' বলে হৈমবতী পিছনের জমিতে ছুটে গেলেন। সেখানে কেউ নেই। হৈমবতী তখন স্বামীর খোঁজে অফিস-ঘরের দিকে ছুটলেন। সেখানে দেখলেন লোহার সিন্দুকের কবাট খোলা রয়েছে, তার ভিতর থেকে নোটের বাণ্ডিল সব অন্তর্হিত হয়েছে। প্রায় সওয়া লাখ টাকার নোট।

এতক্ষণে হৈমবতী প্রকৃত ব্যাপার বুঝতে পারলেন ঃ মানেক মেহতা তাঁর স্বামীকে ঠেলে খাদের মধ্যে ফেলে দিয়েছে আর সমস্ত টাকা নিয়ে পালিয়েছে! তিনি চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।—

ভাই অজিত, আজ এইখানেই থামতে হল। ঘরের মধ্যে অশরীরীর উৎপাত আরম্ভ হয়েছে। কাল বাকি চিঠি শেষ করব।

৪ঠা জানুআরি। কাল চিঠি শেষ করতে পারিনি, আজ রাত্রি দশটার পর মোমবাতি জ্বালিয়ে আবার আরম্ভ করেছি। হোমজি

খেতে বসে গল্প বলছিলেন। গল্প শেষ হবার আগেই খাওয়া শেষ হল, আমরা বসবার ঘরে উঠে গেলাম। চাকর কফি দিয়ে গেল।

হোমজি আবার বলতে শুরু করলেন। আমি আজ আরও সংক্ষেপে তার পুনরাবৃত্তি করছি।—

হৈমবতীর যখন জ্ঞান হল তখন দশটা বেজে গেছে, ইলেকট্রিক বাতি নিভে গিয়ে চারিদিক অন্ধকার। হৈমবতী চাকরানীকে জাগালেন ; কিন্তু সে রাত্রে বাইরে থেকে কোনও সাহায্যই পাওয়া গেল না। পুলিস এল পরদিন সকালে।

পুলিসের অনুসন্ধানে বোঝা গেল হৈমবতীর অনুমান ঠিক। হোটেলের পিছনে খাদের ধারে মানুষের ধস্তাধস্তির চিহ্ন রয়েছে। দু'চার দিন অনুসন্ধান চালাবার পর আরও অনেক খবর বেরুল। মানেক মেহতা ডুব মেরেছে। সে পাকিস্তান থেকে তিন লক্ষ টাকার সোনা আমদানি করেছিল, কাস্টম্‌সের কাছে ধরা পড়ে যায়। মানেক মেহতা ধরা না পড়লেও একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল। তাই অংশীদারকে খুন করে সে প্রায় দেড় লাখ টাকা হাতিয়েছে।

এদিকে খাদের তলা থেকে বিজয় বিশ্বাসের লাস উদ্ধার করা দরকার। কিন্তু এমন দুর্গম এই খাদ যে, সেখানে পৌঁছুনো অতি কষ্টকর ব্যাপার। উপরন্তু সম্প্রতি একজোড়া বাঘ এসে খাদের মধ্যে আড্ডা গেড়েছে। গভীর রাত্রে তাদের হাঁকার শোনা যায়। যা হোক, কয়েকজন পাহাড়ীকে নিয়ে তিনদিন পরে পুলিস খাদে নেমে দেখল বিজয় বিশ্বাসের দেহের বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই ; কয়েকটা হাড়গোড় আর রক্তমাখা কাপড়জামা, গলাবন্ধ ইত্যাদি নিয়ে তারা ফিরে এল। পুলিসের মনে আর কোনও সংশয় রইল না, মানেক মেহতার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা এবং হুলিয়া জারি করল।

ক্রমে ১লা ডিসেম্বর এসে পড়ল। নিঃস্ব বিধবার অবস্থা বুঝতেই পারছো। হোমজি দয়ালু লোক, হৈমবতীকে কিছু টাকা দিলেন।

হৈমবতী চোখের জল মুছতে মুছতে মহাবলেশ্বর থেকে চিরবিদায় নিলেন।

তারপর মাসখানেক কেটে গেছে। পুলিস এখনও মানেক মেহতার সন্ধান পায়নি। বাঘ আর বাঘিনী কিন্তু এখনও খাদের তলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। মানুষের রক্তের স্বাদ তারা পেয়েছে, এ স্থান ছেড়ে যেতে পারছে না।

হোমজির গল্প শুনে মনটা একটু খারাপ হল। বাঙালীর সন্তান সুদূর বিদেশে এসে কিছু অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন, তা কপালে সইল না। হৈমবতীর অবস্থা আরও শোচনীয়। মানেক মেহতাকে পুলিস ধরতে পারবে কিনা কে জানে; ভারতবর্ষের বিশাল জনসমুদ্র থেকে একটি পুঁটিমাছকে ধরা সহজ নয়।

এই সব ভাবছি এমন সময় হঠাৎ ইলেক্‌ট্রিক বাতি নিভে গেল। বললাম,—'এ কি!'

হোমজি বললেন,—'দশটা বেজেছে। এখানে রাত্রি দশটার সময় ইলেক্‌ট্রিক বন্ধ হয়ে যায়, আবার শেষ রাত্রে কিছুক্ষণের জন্যে জ্বলে!—চলুন, আপনাকে আপনার শোবার ঘরে পৌঁছে দিই।'

হোমজির একটা লম্বা গদার মত ইলেকট্রিক টর্চ আছে, সেটা হাতে নিয়ে তিনি আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন। দোতলায় এক সারি ঘর, সামনে টানা বারান্দা। সব ঘরের দরজায় তালা ঝুলছে, কেবল কোণের ঘরের দরজা খোলা। চাকর ঘরে মোমবাতি জ্বেলে রেখে গেছে। (ভাল কথা, এদেশে মোমবাতিকে মেমবাতি বলে; ভারি কবিত্বপূর্ণ নাম নয়?)

বেশ বড় ঘর; সামনে বারান্দা, পাশে ব্যাল্‌কনি। ঘরের দু'পাশে দু'টো খাট রয়েছে; একটাতে বিছানা পাতা, অন্যটা উলঙ্গ পড়ে আছে। ঘরের মাঝখানে একটা বড় টেবিল আর দু'টো চেয়ার, দেয়ালের গায়ে ঠেকানো ওয়ার্ডরোব। টেবিলের ওপর একটি অ্যালার্ম টাইমপীস্। এক বাণ্ডিল মোমবাতি, দেশলাই,

একটা থার্মোফ্লাস্কে গরম কফি ; রাত্রে যদি তেষ্টা পায়, খাব। হোমজি অতিথি সৎকারের ক্রুটি রাখেননি।

হোমজি বললেন,—'এই ঘরে বিজয় বিশ্বাস স্ত্রীকে নিয়ে থাকতেন। হৈমবতী চলে যাবার পর ঘরটা যেমন ছিল তেমনি আছে। আপনার কোনও অসুবিধে হবে না তো ?'

বললাম,—'অসুবিধে কিসের। খুব আরামে থাকব। আপনি যান, এবার শুয়ে পড়ুন গিয়ে। এখানে বোধহয় সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়াই রেওয়াজ।'

হোমজি হেসে বললেন,—'শীতকালে তাই বটে। কিন্তু সকাল আটটা ন'টার আগে কেউ বিছানা ছাড়ে না। আপনি যদি আগে উঠতে চান, ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রাখবেন। এই টর্চটা রাখুন, রাত্রে যদি দরকার হয়।'

'ধন্যবাদ।'

হোমজি নেমে গেলেন। আমি দরজা বন্ধ করে দিলাম। মোমবাতির আলোয় ঘরটা আবছায়া দেখাচ্ছে। আমি টর্চটা জ্বালিয়ে ঘরময় একবার ঘুরে বেড়ালাম। আমার সুটকেস চাকর ওয়ার্ডরোবের পাশে রেখে গেছে। ওয়ার্ডরোব খুলে দেখলাম সেটা খালি। এসেন্স-কর্পূর-ন্যাপথলিন্ মেশা একটা গন্ধ নাকে এল। হৈমবতী এই ওয়ার্ডরোবেই নিজের কাপড়চোপড় রাখতেন।···ঘরের পিছন দিকে একটা সরু দরজা রয়েছে, খুলে দেখলাম গোসলখানা। আবার বন্ধ করে দিলাম। তারপর চেয়ারে এসে বসে সিগারেট ধরালাম।

ঘরের দরজা-জানালা সবই বন্ধ, তবু যেন একটা বরফজমানো ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বেশিক্ষণ বসে থাকা চলবে না ; তাড়াতাড়ি সিগারেট শেষ করে ঘড়িতে অ্যালার্ম দিলাম, সাড়ে সাতটার সময় ঘুম ভাঙলেই যথেষ্ট। আপ্টে আসবেন ন'টার সময়।

টর্চটা বালিশের পাশে নিয়ে মোমবাতি নিভিয়ে বিছানায়

ঢুকলাম। বিছানায় দুটো মোটা মোটা গদি, গোটা চারেক বিলিতী কম্বল ; একেবারে রাজশয্যা। ক্রমশ কম্বলের মধ্যে শরীর গরম হতে লাগল। কখন ঘুমিয়ে পড়লাম।

আশ্চর্য এই যে, প্রথম রাত্রে ঘুমোবার আগে পর্যন্ত অতিপ্রাকৃত কোনও ইশারা-ইঙ্গিত পাইনি।

ঘুম ভাঙল ঝন্‌ঝন্‌ অ্যালার্মের শব্দে। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলাম। ঘর অন্ধকার ; কোথায় আছি মনে করতে কয়েক সেকেণ্ড কেটে গেল। তারপর মনে পড়ল। কিন্তু—এত শীগগির সাড়ে সাতটা বেজে গেল ! কৈ জানালার শার্সি দিয়ে দিনের আলো দেখা যাচ্ছে না তো !

টর্চ জ্বেলে ঘড়ির উপর আলো ফেললাম। চোখে ঘুমের জড়তা রয়েছে, মনে হয় ঘড়িতে দু'টো বেজেছে ! কিন্তু অ্যালার্ম ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে বেজে চলেছে।

কি রকম হল ! আমি কম্বল ছেড়ে উঠলাম, টেবিলের কাছে গিয়ে ঘড়ির উপর আলো ফেলে দেখলাম—সত্যিই দু'টো। তবে অ্যালার্ম বাজল কি করে ? অ্যালার্মের কাঁটা ঘোরাতে কি ভুল করেছি ?

ঘড়িটা হাতে তুলে নিতেই বাজনা থেমে গেল ! দেখলাম অ্যালার্মের কাঁটা ঠিকই সাড়ে সাতটার উপর আছে।

হয়তো ঘড়িটাতে গলদ আছে, অসময়ে অ্যালার্ম বাজে। আমি ঘড়ি রেখে আবার বিছানায় ঢুকলাম। অনেকক্ষণ ঘুম এল না। তারপর আবার কখন ঘুমিয়ে পড়েছি।

এই হল প্রথম রাত্রির ঘটনা।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট খেতে বসে হোমজিকে জিগ্যেস করলাম,—'আপনার টাইমপীসে কি অসময়ে অ্যালার্ম বাজে ?'

তিনি ভুরু তুলে বললেন,—'কৈ না। কেন বলুন তো ?'

বললাম। তিনি শুনে উদ্বিগ্ন মুখে একটু চুপ করে রইলেন ;

তারপর বললেন—'হয়তো সম্প্রতি খারাপ হয়েছে। আমার অন্য একটা অ্যালার্ম ঘড়ি আছে, সেটা আজ রাত্রে আপনাকে দেব।'

আমি আপত্তি করতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় চাকর একটা চিঠি এনে আমার হাতে দিল।

আপ্টের চিঠি। তিনি লিখেছেন, কাল রাত্রে হঠাৎ পা পিছলে গিয়ে তাঁর পায়ের গোছ মচ্‌কে গেছে, নড়ার ক্ষমতা নেই। আমরা যদি দয়া করে আসি।

চিঠি হোমজিকে দেখালাম। তিনি মুখে চুক্‌চুক্ শব্দ করে বললেন,—'চলুন, দেখে আসি।'

জিগ্যেস করলাম,—'কত দূর ?'

'মাইল তুই হবে। বাজারের মধ্যে। এখানে মহারাষ্ট্র ব্যাঙ্কের একটা ব্রাঞ্চ আছে, আপ্টের আত্মীয় তার ম্যানেজার। ব্যাঙ্কের উপরতলায় থাকেন।'

ব্রেকফাস্ট সেরে বেরুলাম। হোমজির একটি ছোটখাটো স্ট্যাণ্ডার্ড মোটর আছে, তাইতে চড়ে গেলাম ; ব্যাঙ্কের বাড়িটা দোতলা, বাড়ির পাশ থেকে খোলা সিঁড়ি ওপরে উঠেছে। আমরা ওপরে উঠে গেলাম।

আপ্টে বালিশের ওপর ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা পা তুলে দিয়ে খাটে শুয়ে আছেন, আমাদের দেখে তু'হাত বাড়িয়ে বললেন, —'কী কাণ্ড দেখুন দেখি ! কোথায় আপনাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াব, তা নয় একেবারে শয্যাশায়ী।'

আমরা খাটের পাশে চেয়ারে বসলাম,—'কি হয়েছিল ?'

আপ্টে বললেন,—'রাত্রে ঘুম ভেঙে শুনলাম, দরজায় কে খুট্‌খুট্ করে টোকা মারছে। বিছানা ছেড়ে উঠলাম, কিন্তু দোর খুলে দেখি কেউ নেই। আবার দোর বন্ধ করে ফিরছি, পা মুচড়ে পড়ে গেলাম। বাঁ পা-টা স্প্রেন্ হয়ে গেল।'

'আর কোথাও লাগেনি তো ?'

'না, আর কোথাও লাগেনি। কিন্তু—' আপ্টে একটু চুপ করে থেকে বললেন,—'আশ্চর্য! আমি হোঁচট্ খাইনি, পায়ে কাপড়ও জড়িয়ে যায়নি। ঠিক মনে হল কেউ আমাকে পিছন থেকে ঠেলে দিলে।'

আমার কি মনে হল, জিগ্যেস করলাম,—'রাত্রি তখন ক'টা?'

'ঠিক দু'টো।'

এ বিষয়ে আর কথা হল না, গৃহস্বামী এসে পড়লেন। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হলেও অনন্তরাও দেশপাণ্ডে বেশ ফুর্তিবাজ লোক। আজকাল ব্যাঙ্কের কাজকর্ম নেই বললেই হয়। তিনি আমাদের সঙ্গে আড্ডা জমালেন। আপ্টের পা ভাঙা নিয়ে খানিকটা ঠাট্টা-তামাশা হল, গরম গরম চিঁড়েভাজা আর পোট্যাটো-চিপ্‌স্ দিয়ে আর এক প্রস্থ কফি হল। তারপর আমরা উঠলাম। আপ্টে কাতরভাবে বললেন,—'ভেবেছিলাম মিস্টার বক্সীকে মহাবলেশ্বর ঘুরিয়ে দেখাব, তা আর হল না। দু' তিন দিন মাটিতে পা রাখতেই পারব না।'

হোমজি বললেন,—'তাতে কি হয়েছে, আমিই ওঁকে মহাবলেশ্বর দেখিয়ে দেব। আমার তো এখন ছুটি।'

কাল আবার আসব বলে আমরা চলে এলাম। দুপুরবেলা লাঞ্চ খেয়ে হোমজির সঙ্গে বেরুলাম। কাছাকাছি কয়েকটা দর্শনীয় স্থান আছে। একটি হ্রদ আছে, তাতে মোটর-লঞ্চ চড়ে বেড়ালাম। মহাবলেশ্বরের মধু বিখ্যাত, কয়েকটি মধুর কারখানা দেখলাম; মৌমাছি মধু তৈরি করছে আর মানুষ তাই বিক্রি করে পয়সা রোজগার করছে। মৌমাছিদের খেতে দিতে হয় না, মজুরি দিতে হয় না, একটি ফুলের বাগান থাকলেই হল।

কিন্তু যাক, বাজে কথা লিখে চিঠি বড় করব না। এখনও আসল কথা সবই বাকি। হোমজির কাছ থেকে একটা চিঠির কাগজের প্যাড্ যোগাড় করেছি, তা প্রায় ফুরিয়ে এল।

সে রাত্রে দশটা বাজবার পাঁচ মিনিট আগে শুতে গেলাম। চাকর

সব ঠিকটাক করে রেখে গিয়েছে। দেখলাম পুরনো ঘড়ির বদলে একটা নতুন অ্যালার্ম ঘড়ি রেখে গেছে। আমি এতে আর দম দিলাম না, অ্যালার্মের চাবিটা এঁটে বন্ধ করে দিলাম। অ্যালার্মের দরকার নেই, যখন ঘুম ভাঙবে তখন উঠব।

আলো নেভার আগেই শুয়ে পড়লাম।

এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি, শুয়ে শুয়ে দেখছি একটা চামচিকে ঘরে ঢুকেছে। দরজা-জানালা সব বন্ধ, তাই পালাতে পারছে না, নিঃশব্দ পাখায় ঘরের এ কোণ থেকে ও কোণে যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে। দরজা খুলে তাকে তাড়ানো যায় কিনা ভাবছি, এমন সময় ইলেক্‌ট্রিক বাতি নিভে গেল। আর উপায় নেই। জন্তুটা সারারাত্রি পালাবার রাস্তা খুঁজে উড়ে বেড়াবে, হয়তো ক্লান্ত হয়ে ঘরের কোণে পড়ে থাকবে।—

অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে ভাবছি, ঘুম আসছে না। কাল রাত্রি দু'টোর সময় আমার ঘরে অকারণে অ্যালার্ম ঘড়ি বাজল, আর ঠিক সেই সময় দু' মাইল দূরে আপ্টের পা মচ্‌কালো, দুটো ঘটনার মধ্যে নৈসর্গিক সম্পর্ক কিছুই নেই। সমাপতন ছাড়া আর কি হতে পারে? অথচ, আপ্টের পা যদি না মচকাতো, তিনি আজ এই ঘরে অন্য খাটে শুতেন।—চামচিকেটা কি এখনও উড়ে বেড়াচ্ছে? আমার গায়ে এসে পড়বে না তো! পড়ে পড়ুক। ইতর প্রাণীকে আমার ভয় নেই। সত্যবতী আরশোলা আর ইঁদুরকে ভয় করে···খোকা ভয় করে টিক্‌টিকিকে···

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কানের কাছে কড়্ কড়্ শব্দে যেন কাড়া-নাকাড়া বেজে উঠল। কম্বলের মধ্যে লাফিয়ে উঠলাম। নতুন ঘড়ির অ্যালার্ম বাজছে। এর আওয়াজ আরও উগ্র। কিন্তু অ্যালার্মবাজার তো কথা নয়; আমি দম দিইনি, চাবি বন্ধ করে দিয়েছি। তবে?

টর্চ জ্বেলে বিছানা থেকে উঠলাম। ঘড়িতে দুটো বেজেছে। (অ্যালার্মের চাবি যেমন বন্ধ ছিল তেমনি বন্ধ, তবু বাজনা বেজে চলেছে।)

ঘড়ি হাতে তুলে নিতেই বাজনা থেমে গেল। যেমন ঘড়ি তেমনি ঘড়ি, অত্যন্ত সহজ এবং স্বাভাবিক।

অজিত, তুমি জানো, আমি রহস্য ভালবাসি না; রহস্য দেখলেই আমার মন তাকে ভেঙে চুরে তার অন্তর্নিহিত সত্যটি আবিষ্কার করতে লেগে যায়। কিন্তু এ কী রকম রহস্য? অলৌকিক ঘটনার প্রতি আমার বুদ্ধি স্বভাবতই বিমুখ, যা প্রমাণ করা যায় না, তা বিশ্বাস করতে আমার বিবেকে বাধে। কিন্তু এ কী? চক্ষু কর্ণ দিয়ে যাকে প্রত্যক্ষ করছি তার সঙ্গে ঐহিক কিছুরই কোনও সংস্রব নেই। অমূলক কারণহীন ঘটনা চোখের সামনে ঘটে যাচ্ছে।

এর মূল পর্যন্ত অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। মোমবাতি জ্বাললাম। তোমাকে আগে লিখেছি ঘরে দুটো চেয়ার আছে। তার মধ্যে একটা সাধারণ খাড়া চেয়ার, অন্যটা দোল্না চেয়ার। আমি গায়ে একটা কম্বল জড়িয়ে নিয়ে দোলনা চেয়ারে বসলাম, সিগারেট ধরিয়ে মৃদু মৃদু দোল খেতে লাগলাম।

দোরের দিকে মুখ করে বসেছি। ডান পাশে টেবিল, বাঁ পাশে দেয়ালে লাগানো ওয়ার্ডরোব, পিছনে আমার খাট। আমি সিগারেট টানতে টানতে দুলছি আর ভাবছি। চামচিকেটা কোথায় ছিল জানি না, বাতি জ্বলতে দেখে আবার উড়তে আরম্ভ করেছে; আমার মাথা ঘিরে চক্কর দিচ্ছে। পাখার শব্দ নেই, কেবল এক টুক্রো জমাট অন্ধকার শূন্যে ঘুরপাক খাচ্ছে।

সিগারেট শেষ করে চোখ বুজে আছি, ভাবছি কী হতে পারে? দু'টো ঘড়িতেই বেতালা অ্যালার্ম বাজে? তবে কি হোমজি আমার সঙ্গে practical joke করছেন! আমি কাল ভূতের কথায় হেসে-ছিলাম, তাই তিনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন। তা যদি হয় তাহলে ঘড়িটার যন্ত্রপাতি খুলে পরীক্ষা করলেই ধরা যাবে। কিন্তু হোমজি বয়স্থ ব্যক্তি, এমন বাঁদুরে রসিকতা করবেন?

কতক্ষণ চোখ বুজে বসে দোল খাচ্ছিলাম বলতে পারি না, মিনিট

পনরোর বেশি নয় ; চোখ খুলে চমকে গেলাম। দোলনার চেয়ারটা দুলতে দুলতে ঘুরে গেছে ; আমি দরজার দিকে মুখ করে বসেছিলাম, এখন ওয়ার্ডরোবের দিকে মুখ করে বসে আছি। শুধু তাই নয়, ওয়ার্ডরোবের খুব কাছে এসে পড়েছি।

চেয়ার ঘুরে যাওয়ার একটা স্বাভাবিক ব্যাখ্যা থাকতে পারে। কিন্তু রাত দুটোর সময় একলা ঘরে এরকম ব্যাপার ঘটলে স্নায়ুমণ্ডলে ধাক্কা লাগে। আমারও লেগেছিল। তার ওপর ঘড়িটা আবার পিছন দিক থেকে ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে বেজে উঠল। আমি লাফিয়ে উঠে ঘড়িটা বন্ধ করতে গেলাম, মোমবাতি নিভে গেল।

বোঝো ব্যাপার! আমার স্নায়ু যদি দুর্বল হত, তাহলে কি করতাম বলা যায় না। কিন্তু আমি দেহটাকে শক্ত করে স্নায়ুর উৎকণ্ঠা দমন করলাম। আমার গায়ের কম্বলের বাতাস লেগে হয়তো মোমবাতি নিভেছে। আমি আবার মোমবাতি জ্বাললাম। ঘড়িটা হাতে নিতেই তার বাজনা থেমে গেল।

কিন্তু ঘড়িকে আর বিশ্বাস নেই। আমি সেটাকে হাতে নিয়ে ওয়ার্ডরোবের কাছে গেলাম। ওয়ার্ডরোবে আমার কাপড়-চোপড় রেখেছি, তার মধ্যে ঘড়ি চাপা দিয়ে রাখব। তারপর ঘড়ি যত বাজে বাজুক।

ওয়ার্ডরোবের কপাট খুলতেই সেন্ট-কর্পূর-ন্যাপথলীন মেশা গন্ধটা নাকে এল। আমি ঘড়িটাকে আমার জামা-কাপড়ের তলায় গুঁজে দিয়ে কপাট বন্ধ করে দিলাম।

আড়াইটে বেজেছে, এখনও অর্ধেক রাত বাকি। আমি আবার কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

মস্তিষ্ক গরম হয়েছে ; তন্দ্রা আসছে আবার ছুটে যাচ্ছে। ঘড়িটা ওয়ার্ডরোবের মধ্যে বাজছে কিনা শুনতে পাচ্ছি না। তারপর ক্রমে বোধ হয় ঘুম এসে গিয়েছিল।—

বিকট চিৎকার করে জেগে উঠলাম। কম্বলের মধ্যে আমার

পেটের কাছে একটা কিছু কিল্‌বিল্‌ করছে। টিকটিকি কিংবা ব্যাঙ্‌ কিংবা চামচিকে। একটানে কম্বল ছড়িয়ে বিছানা থেকে লাফিয়ে নামলাম; টর্চ জ্বাললাম, মোমবাতি জ্বাললাম। বিছানায় কোনও জন্তু-জানোয়ার নেই। চামচিকেটাও কোথায় অদৃশ্য হয়েছে। হাত-ঘড়িতে দেখলাম রাত্রি সাড়ে তিনটে।

বাকি রাত্রিটা টেবিলের সামনে খাড়া চেয়ারে বসে কাটিয়ে দিলাম। আর ঘুমোবার চেষ্টা বৃথা।

চিঠি ভীষণ লম্বা হয়ে যাচ্ছে। ভৌতিক অভিজ্ঞতার বিবরণ লেখা আমার উদ্দেশ্য নয়। এবার চটপট শেষ করব।

পাঁচটার সময় ইলেক্‌ট্রিক আলো জ্বলে উঠলো।

আমি ওয়ার্ডরোব খুলে ঘড়ি বার করলাম। ঘড়ির সঙ্গে একটা বাদামী কাগজের চিল্‌তে বেরিয়ে এল। তাতে বাংলা হরফে একটা ঠিকানা লেখা আছে। কলকাতার দক্ষিণ সীমানার একটা ঠিকানা। ঠিকানাটা নকল করে পাঠালাম, তোমার দরকার হবে।

আমার স্কাউট-ছুরি দিয়ে ঘড়িটা খুললাম। যন্ত্রপাতির কোনও গণ্ডগোল নেই। সহজ ঘড়ি।

আমি সত্যান্বেষী। সত্যকে স্বীকার করতে আমি বাধ্য, তা সে লৌকিক সত্যই হোক, আর অলৌকিক সত্যই হোক। কায়াহীনকে সম্বোধন করে বললাম,—'তুমি কী চাও ?'

উত্তর এল না, কেবল টেবিলটা নড়ে উঠল। আমি টেবিলের ওপর হাত রেখে বসেছিলাম।

বললাম,—'তুমি কি চাও আমি তোমার মৃত্যুর তদন্ত করি ?'

এবার টেবিল তো নড়লই, আমি যে চেয়ারে বসে ছিলাম তার পিছনের পায়াদু'টো উঁচু হয়ে উঠল। আমি প্রায় টেবিলের উপর হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়লাম।

বললাম,—'বুঝেছি। কিন্তু পুলিস তো তদন্ত করছেই। আমি করলে কী সুবিধে হবে ? আমি কোথায় তদন্ত করব ?'

ঘড়িটা চড়াং করে একবার বেজেই থেমে গেল। ঠিকানা লেখা বাদামী কাগজের চিল্‌তেটা টেবিলের একপাশে রাখা ছিল, সেটা যেন হাওয়া লেগে আমার সামনে সরে এল।

আমার মাথায় একটা আইডিয়া এল। মানেক মেহতা কি বাংলাদেশে গিয়ে লুকিয়ে আছে? আশ্চর্য নয়। একলা লুকিয়ে আছে? কিংবা—

বললাম,—'হুঁ, আচ্ছা, চেষ্টা করব।'

এই সময় ইলেকট্রিক বাতি নিভে গেল; দেখলাম জানালার শার্সি দিয়ে দিনের আলো দেখা যাচ্ছে।

হোমজিকে কিছু বললাম না। ন'টার সময় দু'জনে আপ্টেকে দেখতে গেলাম। মোটরে যেতে যেতে হোমজিকে জিগ্যেস করলাম,—'হৈমবতীর চেহারা কেমন?'

হোমজি আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে একটু হাসলেন, বললেন,—'ভাল চেহারা। রঙ খুব ফরসা নয়, কিন্তু ভারি চটক্‌দার চেহারা।'

'বয়স?'

'হয়তো ত্রিশের কিছু বেশি। কিন্তু দীর্ঘযৌবনা, শরীরের বাঁধুনি ঢিলে হয়নি।'—

আপ্টের পা কালকের চেয়ে ভাল, কিন্তু এখনও হাঁটতে পারেন না। গৃহস্বামী অনন্তরাও দেশপাণ্ডের সঙ্গেও দেখা হল। তাঁকে কয়েকটা প্রশ্ন করলাম—

'আপনি বিজয় বিশ্বাসকে চিনতেন?'

'চিনতাম বৈকি। সহ্যাদ্রি হোটেলের সব টাকাই আমার ব্যাঙ্কে ছিল।'

'কত টাকা?'

'সীজনের শেষে প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার দাঁড়িয়েছিল।'

'বিজয় বিশ্বাসের নিজের আলাদা কোনও অ্যাকাউন্ট ছিল?'

'ছিল। আন্দাজ দু'হাজার টাকা। কিন্তু মৃত্যুর কয়েকদিন

আগে তিনি প্রায় সব টাকা বার করে নিয়েছিলেন। শ'খানেক টাকা পড়ে আছে।'

'তাঁর স্ত্রী যাবার আগে সে টাকা বার করে নেননি?'

'স্ত্রী যতক্ষণ কোর্ট থেকে ওয়ারিশ সাব্যস্ত না হচ্ছেন, ততক্ষণ তো তাঁকে টাকা দিতে পারি না।'

'হৈমবতী এখন কোথায়? তাঁর ঠিকানা জানেন?'

'না।'

'আর কেউ জানে?'

হোমজি বললেন,—'বোধহয় না। যাবার সময় তিনি নিজেই জানতেন না কোথায় যাবেন।'

আমি আপ্টেকে জিগ্যেস করলাম,—'আপনি নিশ্চয় এ মামলার খবর রাখেন। মানেক মেহতার কোনও সন্ধান পাওয়া গেছে?'

তিনি বললেন,—'না। সন্ধান পাওয়া গেলে আমি জানতে পারতাম।'

'মানেক মেহতার ফটোগ্রাফ আছে?'

'একটা গ্রুপ ফটোগ্রাফ ছিল। সহ্যাদ্রি হোটেল যখন আরম্ভ হয় তখন মানেক মেহতা, বিজয় বিশ্বাস আর হৈমবতী একসঙ্গে ছবি তুলিয়েছিল। কিন্তু সেটা পাওয়া যায়নি।'

হোটেলে ফিরে এসে দুপুরবেলা খুব ঘুমোলাম। রাত্রে তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছিলাম, কিন্তু বার বার বাধা পেয়ে শেষ করতে পারিনি। বিদেহাত্মা আমার এই চিঠি লেখাতে সন্তুষ্ট নয়, অথচ সে কী চায় বোঝাতে পারছে না। যাহোক আজ চিঠি শেষ করব।

এতখানি ভণিতার কারণ বোধহয় বুঝতে পেরেছ। তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। কলকাতার দক্ষিণ প্রান্তের যে ঠিকানা দিলাম তুমি সেখানে যাবে। যদি সেখানে হৈমবতী বিশ্বাসের দেখা না পাও তাহলে কিছু করবার নেই। কিন্তু যদি দেখা পাও, তাহলে

তাঁকে কয়েকটা প্রশ্ন করবেঃ মানেক মেহতার সঙ্গে তাঁদের যে গ্রুপ-ফটো তোলা হয়েছিল সেটা কোথায়? মানেক মেহতার সঙ্গে হৈমবতীর বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল কি না জানবার চেষ্টা করবে। কবে কোথায় বিশ্বাসদের সঙ্গে মেহতার পরিচয় হয়েছিল? হৈমবতীর আর্থিক অবস্থা এখন কেমন? বাড়িতে কে কে আছে— সব খবর নেবে। যে প্রশ্নই তোমার মনে আসুক জিগ্যেস করবে। তারপর সব কথা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে আমাকে লিখে জানাবে; কোনও কথা তুচ্ছ বলে বাদ দেবে না। যদি সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ে টেলিগ্রাম করে আমাকে জানাবে।

তোমার চিঠির অপেক্ষায় থাকব। এখানে এই দারুণ শীতে বেশিদিন থাকার ইচ্ছে নেই, কিন্তু এ ব্যাপারের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত চলে যেতেও পারছি না।

আশা করি খোকা ও সত্যবতী ভাল আছে এবং তুমি ইনফ্লুএঞ্জা ঝেড়ে ফেলে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছ।

ভালবাসা নিও। —তোমার ব্যোমকেশ

কলিকাতা
৮ই জানুআরি

ভাই ব্যোমকেশ,

তোমার চিঠি আজ সকালে পেয়েছি এবং রাত্রে বসে জবাব লিখছি। হায় নাস্তিক, তুমি শেষে ভূতের খপ্পরে পড়ে গেলে! সত্যবতী জানতে চাইছে, ভূত বটে তো? পেত্নী নয়? ওদিকের পেত্নীরা নাকি ভারি জাঁহাবাজ হয়।

যাক, বাজে কথা লিখে পুঁথি বাড়াব না। তোমার নির্দেশ অনুযায়ী আজ বেলা তিনটে নাগাদ বাসা থেকে বেরুচ্ছি, বিকাশ দত্ত এল। আমি কোথায় যাচ্ছি শুনে সে বলল,—'আরে সর্বনাশ, সে যে ধাদ্ধাড়া গোবিন্দপুর। পথ চিনে যেতে পারবেন?'

বললাম,—'তুমিও চল না।' বিকাশ রাজী হল। তাকে সব বললাম না, মোটামুটি একটা আন্দাজ দিলাম।

দু'জনে চললাম। সত্যিই ধাদ্ধাড়া গোবিন্দপুর। ট্রামে বাসে কলকাতার দক্ষিণ সীমানা ছাড়িয়ে যেখানে গিয়ে পৌঁছুলাম সেখানে কেবল একটি লম্বা রাস্তা চলে গিয়েছে। রাস্তায় দু'তিন শো গজ অন্তর একটা বাড়ি। শেষ পর্যন্ত বেলা আন্দাজ সাড়ে চারটের সময় নির্দিষ্ট ঠিকানায় উপস্থিত হলাম। রাস্তা থেকে খানিক পিছিয়ে ছোট একতলা বাড়ি; চারিদিকে খোলা মাঠ। বিকাশকে বললাম,—'তুমি রাস্তার ধারে গাছতলায় বসে বিড়ি খাও। আমি এখনি ফিরতে পারি, আবার ঘণ্টাখানেক দেরি হতে পারে।'

বাড়ির সদর দরজা বন্ধ, আমি গিয়ে কড়া নাড়লাম। একটা চাকর এসে দরজা খুলে দাঁড়াল। বলল,—'কাকে চান?'

বললাম,—'শ্রীমতী হৈমবতী বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'আপনার নাম?'

'অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়।'

'কী দরকার?'

'সেটা শ্রীমতী বিশ্বাসকেই বলব। তুমি তাঁকে বোলো মহাবলেশ্বর থেকে চিঠি পেয়ে এসেছি।'

'আজ্ঞে। একটু দাঁড়ান।' বলে চাকরটা দরজা বন্ধ করে দিল।

দশ মিনিট দাঁড়িয়ে আছি; সাড়াশব্দ নেই। তারপর দরজা খুলল। চাকরটা বলল,—'আসুন।'

বাড়িতে ঢুকেই ঘর। আসবাবপত্র বেশি কিছু নেই, দুটো চেয়ার, একটা টেবিল। চাকর বলল,—'আজ্ঞে বসুন। গিন্নী ঠাকরুন চান করছেন, এখনি আসবেন।

একটা চেয়ারে বসলাম। বসে আছি তো বসেই আছি। চাকরটা এদিক-ওদিক ঘুরঘুর করছে, বোধ হয় আমাকে বিশ্বাস করতে পারছে

না। আজকাল কলকাতার যা ব্যাপার দাঁড়িয়েছে, অচেনা লোককে বাড়িতে ঢুকতে দিতে ভয় হয়। চোর-ডাকাত-গুণ্ডা যা-কিছু হতে পারে।

বসে বসে ভাবলাম, গিন্নী ঠাকরুনের স্নান যতক্ষণ না শেষ হচ্ছে ততক্ষণ চাকরটাকে নিয়েই একটু নাড়াচাড়া করি। বললাম—'তুমি কতদিন এখানে কাজ করছ ?'

চাকরটা অন্দরের দোরের সামনে দাঁড়িয়ে বলল,—'আজ্ঞে, এই তো একমাসও এখনও হয়নি।'

দেখলাম লোকটির কথায় একটু পূর্ববঙ্গের টান আছে।

'তোমার দেশ কোথায় ?'

'ফরিদপুর জেলায়'—বলে সে চৌকাঠের ওপর উপু হয়ে বসল। আধবয়সী লোক, মাথায় কদমছাট চুল, গায়ে একটা ছেঁড়া ময়লা রঙের সোয়েটার।

'কতদিন কলকাতায় আছ ?'

'তা তিন বছর হতে চলল।'

'এখানে—মানে এই বাড়িতে—ক'জন মানুষ থাকে ?'

'গিন্নী ঠাকরুন একলা থাকেন।'

'স্ত্রীলোক—একলা থাকেন। পুরুষ কেউ নেই ?'

'আজ্ঞে না। আমি বুড়োমানুষ দেখাশুনা করি।

'এখানে কারুর যাওয়া-আসা আছে ?'

'আজ্ঞে না, আপনিই পের্‌থম এলেন।'

এই সময় হৈমবতীকে দোরের কাছে দেখা গেল। চাকরটা উঠে দাঁড়াল, আমিও দাঁড়ালাম। ইতিমধ্যে ঘরের মধ্যে দিনের আলো কমে গিয়েছিল, তিনি চাকরকে বললেন,—'মহেশ, আলো জ্বেলে নিয়ে এস।'

চাকর চলে গেল। অল্প আলোতেও মহিলাটিকে দেখার অসুবিধা ছিল না। দীঘল চেহারা, সুশ্রী মুখ, পার্সীদের চোখে খুব ফরসা না

লাগলেও আমার চোখে বেশ ফরসা। মুখে একটি চিত্তাকর্ষক সৌকুমার্য আছে। যৌবনের চৌকাঠ পার হতে গিয়ে যেন থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। পরনে সাদা থান, গায়ে একটিও অলঙ্কার নেই। কবিত্ব করছি না, কিন্তু তাঁর সদ্যস্নাত চেহারাটি দেখে বৃষ্টি-ভেজা সন্ধ্যার রজনীগন্ধার কথা মনে পড়ে যায়।

আমি হাতজোড় করে নমস্কার করলাম ; তিনি প্রতিনমস্কার করে বললেন,—'আপনি মহাবলেশ্বর থেকে আসছেন ?'

আমি বললাম,—'না, আমার বন্ধু ব্যোমকেশ বক্সী মহাবলেশ্বরে আছেন, তাঁর চিঠি পেয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'তবে কি মানেক মেহতা ধরা পড়েছে ?' তাঁর কণ্ঠস্বরে আগ্রহ ফুটে উঠল।

বললাম,—'না, এখনও ধরা পড়েনি।'

হৈমবতী আস্তে আস্তে চেয়ারে বসলেন, নিরাশ স্বরে বললেন,—'বসুন। আমার কাছে এসেছেন কেন ?'

আমি বসলাম, বললাম,—'আমার বন্ধু ব্যোমকেশ বক্সী—'

তিনি বললেন,—'ব্যোমকেশ বক্সী কে ? পুলিসের লোক ?'

'না। ব্যোমকেশ বক্সীর নাম শোনেননি'—এই বলে তোমার পরিচয় দিলাম। তাঁর মুখ নিরুৎসুক হয়ে রইল। দেখা যাচ্ছে তুমি নিজেকে যতটা বিখ্যাত মনে কর, ততটা বিখ্যাত নও। সব শুনে হৈমবতী বললেন,—'আমি জানতুম না। সারা জীবন বিদেশে কেটেছে—'

এই সময় মহেশ চাকর একটা লণ্ঠন এনে টেবিলের ওপর রেখে চলে গেল। বলা বাহুল্য, বাড়িতে বৈদ্যুতিক সংযোগ নেই।

লণ্ঠনের আলোয় হৈমবতীর মুখ আরও স্পষ্টভাবে দেখলাম। ব্যথিত আশাহত মুখ ক্লান্তিভরে থমথম করছে, দু'একগাছি ভিজে চুল কপালে গালে জুড়ে রয়েছে। আমার মন লজ্জিত হয়ে উঠল ; এই শোক-নিষিক্তা মহিলাকে বেশি কষ্ট দেওয়া উচিত নয়, তাড়াতাড়ি

প্রশ্নগুলো শেষ করে চলে যাওয়াই কর্তব্য। বললাম,—'আমাকে মাফ করবেন। মানেক মেহতাকে ধরবার উদ্দেশ্যেই ব্যোমকেশ আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করে পাঠিয়েছে।—মানেক মেহতার সঙ্গে আপনাদের প্রথম পরিচয় কবে হয়?'

হৈমবতী বললেন,—'ছয় বছর আগে। আমাদের তখন আমেদাবাদে ছোট্ট একটি হোটেল ছিল। কি কুক্ষণেই যে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল!'

'মানেক মেহতার সঙ্গে আপনার বেশ ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল?'

'আমার সঙ্গে তার সর্বসাকুল্যে পাঁচ-ছয় বারের বেশি দেখা হয়নি। বছরের মধ্যে একবার কি দু'বার আসত; চুপিচুপি আসত, নিজের ভাগের টাকা নিয়ে চুপিচুপি চলে যেত।'

'তার এই চুপিচুপি আসা-যাওয়া দেখে তার চরিত্র সম্বন্ধে আপনাদের কোন সন্দেহ হয়নি?'

'না। আমরা ভাবতাম তার স্বভাবই ওই রকম, নিজেকে জাহির করতে চায় না।'

'তার কোনও ফটোগ্রাফ আছে কি?'

একটা গ্রুপ-ফটো ছিল, সহ্যাদ্রি হোটেলের অফিসে টাঙানো থাকত। সে রাত্রে আমি মূর্ছা ভেঙে দেখলুম দেয়ালে ছবিটা নেই।'

'সে রাত্রে হোটেলের লোহার সিন্দুকে কত টাকা ছিল?'

'ঠিক জানি না। আন্দাজ দেড় লাখ।'

অতঃপর আর কি প্রশ্ন করব ভেবে পেলাম না। আমি উঠি-উঠি করছি, হৈমবতী আমাকে প্রশ্ন করলেন,—'আমি এখানে আছি আপনার বন্ধু জানলেন কি করে? আমি তো কাউকে জানাইনি।'

উত্তর দিতে গিয়ে থেমে গেলাম। মহিলাটির বর্তমান মানসিক অবস্থায় ভূত-প্রেতের অবতারণা না করাই ভাল। বললাম,—'তা জানি না, ব্যোমকেশ কিছু লেখেনি। আপনি উপস্থিত এখানেই আছেন তো?'

হৈমবতী বললেন,—'বোধহয় আছি। আমার স্বামীর এক বন্ধু তাঁর এই বাড়িতে দয়া করে থাকতে দিয়েছেন।—আসুন, নমস্কার।'

বাইরে এসে দেখলাম অন্ধকার হয়ে গেছে। রাস্তার ধারে গাছের তলায় বিড়ির মুখে আগুন জ্বলছে, তাই দেখে বিকাশের কাছে গেলাম। তারপর দু'জনে ফিরে চললাম। ভাগ্যক্রমে খানিক দূর যাবার পর একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল।

ট্যাক্সিতে যেতে যেতে বিকাশ বলল,—'কাজ হল ?'

এই কথা আমিও ভাবছিলাম। হৈমবতীর দেখা পেয়েছি বটে, তাঁকে প্রশ্নও করেছি ; কিন্তু কাজ হ'ল কি ? মানেক মেহতা এখন কোথায় তার কিছুমাত্র ইঙ্গিত পাওয়া গেল কি ? বললাম—'কতকটা হ'ল।'

বিকাশ খানিক চুপ করে থেকে বলল,—'আপনি যখন ব্যোমকেশবাবুকে চিঠি লিখবেন, তখন তাঁকে জানাবেন যে, শোবার ঘরে দু'টো খাট আছে।'

অবাক হয়ে বললাম,—'তুমি জানলে কি করে ?'

বিকাশ বলল,—'আপনি যখন মহিলাটির সঙ্গে কথা বলছিলেন আমি তখন বাড়ির সব জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখেছি।'

'তাই নাকি ! আর কি দেখলে ?'

'যা কিছু দেখলাম, শোবার ঘরেই দেখলাম ! অন্য ঘরে কিছু নেই।'

'কী দেখলে ?'

'একটা মাঝারি গোছের লোহার সিন্দুক আছে। আমি যখন কাঁচের ভেতর দিকে উঁকি মারলাম, তখন চাকরটা সিন্দুকের হাতল ধরে ঘোরাবার চেষ্টা করছিল।'

'চাকরটা ! ঠিক দেখেছ ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। সে যখন সদর দরজা খুলেছিল তখন আমি তাকে দেখেছিলাম। সে ছাড়া বাড়িতে অন্য পুরুষ নেই।'—

তারপর লেকের কাছাকাছি এসে ট্যাক্সি ছেড়ে দিলাম। বিকাশ নিজের রাস্তা ধরল, আমি বাসায় ফিরে এলাম। রাত্রে বসে চিঠি লিখছি, কাল সকালে ডাকে দেব।

তুমি কেমন আছ? সত্যবতী আর খোকা ভাল আছে। আমি আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছি।

—তোমার অজিত।

*　　*　　*　　*

আমি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় এই কাহিনীর শেষাংশ লিখিতেছি।

ব্যোমকেশের নামে সহ্যাদ্রি হোটেলের ঠিকানায় চিঠি লিখিয়া ডাকে দিয়াছিলাম ৯ তারিখের সকালে। ১২ তারিখের বিকাল বেলা অনুমান তিনটার সময় ব্যোমকেশ আসিয়া উপস্থিত। সবিস্ময়ে বলিলাম,—'একি! আমার চিঠি পেয়েছিলে?'

'চিঠি পেয়েই এলাম। প্লেনে এসেছি।—তুমি চটপট তৈরি হয়ে নাও, এখুনি বেরুতে হবে।'—বলিয়া ব্যোমকেশ ভিতর দিকে চলিয়া গেল।

আধঘণ্টার মধ্যে বাড়ি হইতে বাহির হইলাম। রাস্তায় বাড়ির সামনে পুলিসের ভ্যান্ দাঁড়াইয়া আছে, তাহাতে একজন ইন্সপেক্টর ও কয়েকজন কনেস্টবল। আমরাও ভ্যানে উঠিয়া বসিলাম।

কয়েকদিন আগে যে সময় হৈমবতীর নির্জন গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলাম, প্রায় সেই সময় আবার গিয়া পৌঁছিলাম। আজ কিন্তু ভৃত্য মহেশ দরজা খুলিয়া দিতে আসিল না। দরজা খোলাই ছিল। আমরা সদলবলে প্রবেশ করিলাম।

বাড়িতে কেহ নাই; হৈমবতী নাই, মহেশ নাই। কেবল আসবাবগুলি পড়িয়া আছে; বাহিরের ঘরে চেয়ার-টেবিল, শয়নকক্ষে দুটি খাট ও লোহার সিন্দুক, রান্নাঘরে হাঁড়ি কলসী। লোহার সিন্দুকের কপাট খোলা, তাহার অভ্যন্তর শূন্য। ব্যোমকেশ করুণ হাসিয়া ইন্সপেক্টরের পানে চাহিল, —'চিড়িয়া উড়েছে।'—

সে-রাত্রে নৈশ ভোজন সম্পন্ন করিয়া ব্যোমকেশ ও আমি তক্তাপোশের উপর গায়ে আলোয়ান জড়াইয়া বসিয়াছিলাম। সত্যবতী খোকাকে ঘুম পাড়াইয়া আসিয়া ব্যোমকেশের গা ঘেঁষিয়া বসিল। বাহিরে একটা হাওয়া উঠিয়াছে, হাওয়ার জোর ক্রমেই বাড়িতেছে। আমাদের ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ, তবু কোন অদৃশ্য ছিদ্রপথে ছুঁচের মত বাতাস প্রবেশ করিয়া গায়ে বিঁধিতেছে।

বলিলাম,—'মহাবলেশ্বরের শীত তুমি খানিকটা সঙ্গে এনেছ দেখছি। আশা করি বিজয় বিশ্বাসের প্রেতটিকেও সঙ্গে আনোনি।'

সত্যবতী ব্যোমকেশের কাছে আর একটু ঘেঁষিয়া বসিল। ব্যোমকেশ আমার পানে একটি সকৌতুক দৃষ্টি হানিয়া বলিল,—'প্রেত সম্বন্ধে তোমার ভুল ধারণা এখনও যায়নি।'

বলিলাম,—'প্রেত সম্বন্ধে আমার ভুল ধারণা থাকা বিচিত্র নয়, কারণ প্রেতের সঙ্গে আমি কখনও রাত্রিবাস করিনি। আচ্ছা ব্যোমকেশ, সত্যিই তুমি ভূত বিশ্বাস কর?'

'যা প্রত্যক্ষ করেছি তা বিশ্বাস করা-না-করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। তুমি ব্যোমকেশ বক্সীর অস্তিত্বে বিশ্বাস কর?'

'ব্যোমকেশ বক্সীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করি কারণ তাকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু ভূত তো চোখে দেখিনি, বিশ্বাস করি কি করে?'

'আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে বলছি না। কিন্তু আমি যদি বিশ্বাস করি, তুমি আপত্তি করবে কেন?'

কিছুক্ষণ নীরবে ধূমপান করিলাম।

'আচ্ছা, ওকথা যাক। বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহু দূর। কিন্তু তোমার ভূতের এত চেষ্টা সত্ত্বেও কার্যসিদ্ধি হ'ল না।'

'কে বলে কার্যসিদ্ধি হয়নি? ভূত চেয়েছিল মস্ত একটা ধোঁকার টাটি ভেঙে দিতে। তা সে দিয়েছে।'

'তার মানে?'

'মানে কি এখনও কিছুই বোঝোনি ?'

'কেন বুঝব না ? প্রথমে অবশ্য আমি হৈমবতীর চরিত্র ভুল বুঝেছিলাম। কিন্তু এখন বুঝেছি হৈমবতী আর মানেক মেহতা মিলে বিজয় বিশ্বাসকে খুন করেছিল। হৈমবতী একটি সাংঘাতিক মেয়েমানুষ।'

'হৈমবতীর চরিত্র ঠিকই বুঝেছ। কিন্তু ভূতকে এখনও চেনোনি। ভূতের রহস্য আরও সাংঘাতিক।'

সত্যবতী ব্যোমকেশের আরও কাছে সরিয়া গেল, হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিয়া বলিল,—'আমার শীত করছে।'

'শীত করছে না ভয় করছে।' ব্যোমকেশ হাসিয়া নিজের আলোয়ানের অর্ধেকটা তাহার গায়ে জড়াইয়া দিল।

বলিলাম,—'এস এস বঁধু এস, আধ আচরে বসো। বুড়ো বয়সে লজ্জা করে না !'

ব্যোমকেশ বলিল,—'তোমাকে আবার লজ্জা কি ! তুমি তো অবোধ শিশু।'

সত্যবতী সায় দিয়া বলিল,—'নয়তো কি ! যার বিয়ে হয়নি সে তো দুধের ছেলে।'

বলিলাম,—'আচ্ছা আচ্ছা, এখন ভূতের কথা হোক। আমি কিছুই বুঝিনি, তুমি সব খোলসা করে বল।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আগে তোমাকে দু'একটা প্রশ্ন করি। মানেক মেহতা বিজয় বিশ্বাসকে খুন করবার জন্য খাদের ধারে নিয়ে গেল কেন ? বিজয় বিশ্বাসই বা গেল কেন ?'

চিন্তা করিয়া বলিলাম,—'জানি না।'

'দ্বিতীয় প্রশ্ন। বিজয় বিশ্বাসের নামে ব্যাঙ্কে হাজার দুই টাকা ছিল। হোটেল বিক্রি হবার আগেই সে টাকা বার করে নিয়েছিল কেন ?'

'জানি না।'

'তৃতীয় প্রশ্ন। তুমি যখন হৈমবতীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলে তখন শীতের সন্ধ্যে হয় হয়। চাকর যখন বলল হৈমবতী স্নান করছেন, তখন তোমার খট্‌কা লাগল না?'

'না। মানে—খেয়াল করিনি।'

'চতুর্থ প্রশ্ন। চাকরটাকে সন্দেহ হয়নি?'

'না। চাকরটাকে সন্দেহ করার কোনও কারণ হয়নি। সে পূর্ববঙ্গের লোক, মাত্র কয়েকদিন হৈমবতীর চাকরিতে ঢুকেছিল। অবশ্য একথা যদি সত্যি হয় যে সে লোহার সিন্দুক খোলবার চেষ্টা করছিল—'

'অজিত, তোমার সরলতা সত্যিই মর্মস্পর্শী। চাকরটা সিন্দুক খোলবার উদ্যোগ করেছিল বটে, কিন্তু চুরি করবার জন্যে নয়।—মহাবলেশ্বরে দু'জন লোক খুন করবার ষড়যন্ত্র করেছিল, তার মধ্যে একজন হচ্ছে হৈমবতী। অন্য লোকটি কে?'

'মানেক মেহতা ছাড়া আর কে হতে পারে?'

ব্যোমকেশ কুটিল হাসিয়া বলিল,—'ঐখানেই ধাপ্পা—প্রচণ্ড ধাপ্পা। হৈমবতী ষড়যন্ত্র করেছিল তার স্বামীর সঙ্গে, মানেক মেহতার সঙ্গে নয়। হৈমবতীর আর যে দোষই থাক, সে পতিব্রতা নারী তাতে সন্দেহ নেই।'

হতবুদ্ধি হইয়া বলিলাম,—'কী বলছ তুমি!'

ব্যোমকেশ বলিল,—'যা বলছি মন দিয়ে শোনো।—হোমজি যখন আমাকে গল্পটা বললেন তখন আমার মনে বিশেষ দাগ কাটেনি। তবু একটা খট্‌কা লেগেছিল: মানেক মেহতা বিজয় বিশ্বাসকে খুন করবার জন্যে খাদের ধারে নিয়ে গেল কেন? বিজয় শীতকাতুরে লোক ছিল, সে-ই বা গেল কেন?'

'তারপর ভূতের উৎপাত শুরু হল। দায়ে পড়ে অনুসন্ধান শুরু করলাম। খটকা ক্রমে সন্দেহে পরিণত হতে লাগল। তারপর ওয়ার্ডরোবের মধ্যে পেলাম একটুকরো বাদামী কাগজে একটা

ঠিকানা ; বাংলা অক্ষরে লেখা কলকাতার উপকণ্ঠের একটা ঠিকানা। আমার মনের অন্ধকার একটু একটু করে দূর হতে লাগল।

'তোমাকে লম্বা চিঠি লিখলাম। তারপর তোমার উত্তর যখন পেলাম তখন আর কোনও সংশয় রইল না। আপ্টে সাহেবকে সব কথা বললাম। তিনি তখনও ঠ্যাং নিয়ে পড়ে আছেন, কিন্তু তখনই কলকাতার পুলিসকে টেলিগ্রাম করলেন এবং আমার প্লেনে আসার ব্যবস্থা করে দিলেন।'

'হৈমবতী আর বিজয় বিশ্বাসকে ধরা গেল না বটে, কিন্তু প্রেতের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, আসল অপরাধী কারা তা জানা গেছে। বলা বাহুল্য, যে প্রেতটা নাছোড়বান্দা হয়ে আমাকে ধরেছিল সে মানেক মেহতা।'

সত্যবতী বলিল,—'সত্যি কি হয়েছিল বল না গো!

ব্যোমকেশ বলিল,—'সত্যি কি হয়েছিল তা জানে কেবল হৈমবতী আর বিজয় বিশ্বাস। আমি মোটামুটি যা আন্দাজ করেছি, তাই তোমাদের বলছি।'

সিগারেট ধরাইয়া ব্যোমকেশ বলিতে আরম্ভ করিল।—'মানেক মেহতা ছিল নামকাটা বদমাশ, আর বিজয় বিশ্বাস ছিল ভিজে বেরাল। একদা কি করিয়া মিলন হল দোঁহে। দু'জনে মিলে হোটেল খুলল। মেহতার টাকা, বিশ্বাসদের মেহনত।

'স্ত্রী-পুরুষে হোটেল চালাচ্ছে, হোটেল বেশ জাঁকিয়ে উঠল। প্রতি বছর ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকা লাভ হয়। মেহতা মাঝে মাঝে এসে নিজের ভাগের টাকা নিয়ে যায়। বিজয় বিশ্বাস নিজের ভাগের টাকা মহাবলেশ্বরের ব্যাঙ্কে বেশি রাখে না, বোধহয় স্ত্রীর নামে অন্য কোথাও রাখে। হয়তো কলকাতারই কোনও ব্যাঙ্কে হৈমবতীর নামে পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা জমা আছে, ওরা দু'জনে ছাড়া আর কেউ তার সন্ধান জানে না।

'এইভাবে বেশ চলছিল, গত বছর মানেক মেহতা বিপদে পড়ে

গেল। তার বেআইনী সোনার চালান ধরা পড়ে গেল। তাকে পুলিস জড়াতে পারল না বটে, কিন্তু অত সোনা মারা যাওয়ায় সে একেবারে সর্বস্বান্ত হয়েছিল। তখন তার একমাত্র মূলধন—হোটেল ; মানেক মেহতা ঠিক করল সে হোটেল বিক্রি করবে। তার নগদ টাকা চাই।

'এখন প্রশ্ন হচ্ছে, হোটেল বিক্রির টাকা কে পাবে। একলা মেহতা পাবে, না বিজয় বিশ্বাসেরও বখরা আছে? ওদের পার্টনার-শিপের দলিল আমি দেখিনি। অনুমান করা যেতে পারে যে মানেক মেহতা যখন হোটেল কেনার টাকা দিয়েছিল, তখন হোটেল বিক্রির টাকাটাও পুরোপুরি তারই প্রাপ্য। আমার বিশ্বাস, মেহতা সব টাকাই দাবি করেছিল।

'হৈমবতী আর বিজয় বিশ্বাস ঠিক করল সব টাকা ওরাই নেবে। ওদের পূর্ব ইতিহাস কিছু জানা যায় না, কিন্তু ওদের প্রকৃতি যে স্বভাবতই অপরাধপ্রবণ তাতে আর সন্দেহ নেই। দু'জনে মিলে পরামর্শ করল। মানেক মেহতা পুলিসের নজরলাগা দাগী লোক, তার ঘাড়ে অপরাধের ভার চাপিয়ে দেওয়া সহজ। স্বামী-স্ত্রী মিলে নিপুণভাবে প্ল্যান গড়ে তুলল।

'কলকাতার উপকণ্ঠে কখন কি ভাবে ওরা বাসা ঠিক করেছিল, আমি জানি না। হয়তো কলকাতার কোনও পরিচিত লোকের মারফত বাসা ঠিক করেছিল। হৈমবতী বাসার ঠিকানা কাগজে লিখে ওয়ার্ডরোবের মধ্যে গুঁজে রেখেছিল, পাছে ঠিকানা ভুলে যায়। পরে অবশ্য ঠিকানা তাদের মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল, তাই হৈমবতী যাবার সময় বাদামী কাগজের টুকরোটা ওয়ার্ডরোবেই ফেলে যায়। কাঠের ওয়ার্ডরোবে বাদামী কাগজের টুকরোটা বোধহয় চোখে পড়েনি। ঐ একটি মারাত্মক ভুল হৈমবতী করেছিল।

'যাহোক, নির্দিষ্ট রাত্রে মানেক মেহতা চুপিচুপি এসে হাজির। হোটেলে একটিও অতিথি নেই। চাকরানীটাকে হৈমবতী নিশ্চয়

ঘুমের ওষুধ খাইয়েছিল। হোটেলে ছিল কেবল হৈমবতী আর বিজয় বিশ্বাস।

'মানেক মেহতাকে ওরা হোটেলের অফিস-ঘরেই খুন করেছিল। এমন ভাবে খুন করেছিল যাতে রক্তপাত না হয়। তারপর ছদ্মবেশ ধারণের পালা। বিজয় বিশ্বাস মানেক মেহতার গা থেকে জামা কাপড় খুলে নিজে পরল, নিজের জামা কাপড় গলাবন্ধ মানেক মেহতাকে পরিয়ে দিল। তারপর দু'জনে লাশ নিয়ে গিয়ে খাদের মধ্যে ফেলে দিল। কিছুদিন থেকে এক ব্যাঘ্রদম্পতি এসে খাদে বাসা নিয়েছিল, সুতরাং লাশের যে কিছুই থাকবে না তা বিশ্বাস-দম্পতি জানত। ব্যাঘ্র-দম্পতির কথা বিবেচনা করেই তারা প্ল্যান করেছিল।

'আসল কাজ শেষ হলে বিজয় বিশ্বাস সমস্ত টাকাকড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। নিশুতি শীতের রাত্রি, কেউ তাকে দেখল না। মানেক মেহতা শহরের বাইরে রাস্তার ধারে মোটর রেখে এসেছিল, সেই মোটরে চড়ে বিজয় বিশ্বাস উধাও হয়ে গেল।

'হৈমবতী ঘাঁটি আগলে রইল। বুকের পাটা আছে ওই মেয়েমানুষটির। তারপর যা যা ঘটেছিল সবই প্রকাশ্য ব্যাপার। একমাত্র সাক্ষী হৈমবতী, সে যা বলল পুলিস তাই বিশ্বাস করল। বিশ্বাস না করার কোনও কারণ ছিল না, মানেক মেহতার চরিত্র পুলিস জানত।

'কয়েকদিন পরে সহ্যাদ্রি হোটেল হোমজির হাতে তুলে দিয়ে শোকসন্তপ্তা বিধবা হৈমবতী মহাবলেশ্বর থেকে চলে গেল। ইতিমধ্যে বিজয় বিশ্বাস কলকাতার বাসায় এসে আড্ডা গেড়েছিল, হৈমবতীও এসে জুটল।

'কিন্তু তারা ভারি হুঁশিয়ার লোক, একেবারে নিশ্চিন্ত হয়নি, সাবধানে ছিল। তাই মহাবলেশ্বরের চিঠি পেয়ে অজিত যখন দেখা করতে গেল তখন হৈমবতী চমকে উঠল বটে কিন্তু ঘাবড়ালো না। হৈমবতীর তখন বোধহয় বিধবার সাজ ছিল না, সে বিধবা সাজতে

গেল। চাকর অজিতকে বাইরের ঘরে বসাল। অজিত যদি এত সরল না হত, তাহলে ওর খটকা লাগত; শীতের সন্ধ্যেবেলা মেয়েরা গা ধুতে পারে, চুল ভিজিয়ে স্নান করে না।

'যাহোক, হৈমবতী যখন এল তখন তার সদ্যস্নাত চেহারা দেখে অজিত মুগ্ধ হয়ে গেল। সে হৈমবতীকে আমার নাম বলল; হৈমবতীর ব্যাপার বুঝতে তিলার্ধ দেরি হল না। অজিত আমার নামটাকে যতখানি অখ্যাত মনে করে, ততখানি অখ্যাত নয় আমার নাম, অজিতের কল্যাণেই নামটা সকলের জানা হয়ে গেছে। কিন্তু সে যাক। বিকাশ ওদিকে জানালা দিয়ে শোবার ঘরে দু'টো খাট আর লোহার সিন্দুক দেখে নিয়েছিল। অজিতের চিঠিতে ওটাই ছিল সবচেয়ে জরুরী কথা। চিঠি পড়ে কিছুই আর জানতে বাকি রইল না।

'কিন্তু ওদের ধরা গেল না। সে রাত্রে অজিত পিছন ফিরবার সঙ্গে সঙ্গেই বোধহয় হৈমবতী লোহার সিন্দুক থেকে টাকাকড়ি নিয়ে অদৃশ্য হয়েছিল। এখন তারা কোথায়, কোন্ ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে কে বলতে পারে। হয়তো তারা কোনওদিনই ধরা পড়বে না, হয়তো ধরা পড়বে। না পড়ার সম্ভাবনাই বেশি। পঁয়ত্রিশ কোটি নর-নারীর বাসভূমি এই ভারতবর্ষ—'

কিছুক্ষণ তিনজনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। বাহিরে যে হাওয়া উঠিয়াছিল তাহা থামিয়া গিয়াছে। ঘড়িতে দশটা বাজিল।

আমি বলিলাম,—'সব সমস্যার তো সমাধান হ'ল, কিন্তু একটা কথা বুঝলাম না। বিজয় বিশ্বাস ও বাড়িতে থাকতো না কেন? কোথায় থাকত? চাকরটা ওদের সম্বন্ধে কি কিছুই সন্দেহ করেনি?'

ব্যোমকেশ গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—'হা ভগবান, তাও বোঝোনি? চাকরটাই বিজয় বিশ্বাস।'